তবুও টুনটুনি তবুও ছোটাচ্চু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পার্ল পাবলিকেশন্স

"রাত্রিবেলা বাসায় খুবই উত্তেজনা। অনেক দিন পর বাসায় এ রকম উত্তেজনা হয়েছে। ছোটাচ্চু একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে আছে। তার মোটামুটি বিধ্বস্ত চেহারা। বড় চাচা ঘরে পায়চারি করছেন, একটু আগে অনেক কষ্ট করে বড় চাচা ছোটাচ্চুকে হাজত থেকে ছুটিয়ে এনেছেন।..."

ছোটাচ্চুর জীবনটি হঠাৎ করে ভিন্ন এক দিকে মোড় নিয়েছে। এই বইটি সেই ভিন্ন ছোটাচ্চুর ভিন্ন জীবনের গল্প!

প্রচ্ছদ • সাদাতউদ্দীন আহমেদ এমিল

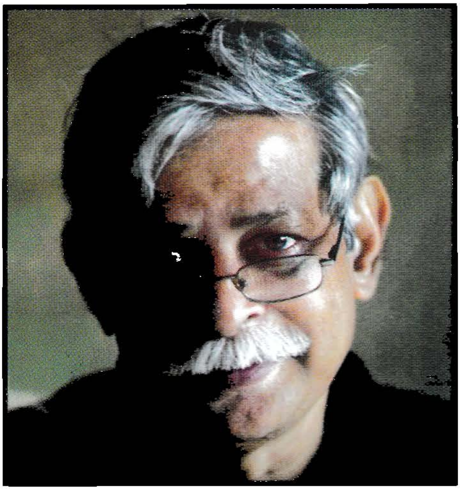

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

আলোকচিত্র • সুমন আহমেদ

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সাদাতউদ্দীন আহ্‌মেদ এমিল

গ্রাফিক্স
স্বদেশ কম্পিউটার

ISBN : 978-984-8055-00-7

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী
কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

মূল : ২২০ টাকা

TBUO TUNTUNI TBUO CHOTACCHU by MUHAMMED ZAFAR IQBAL
Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
Date of Publication : February 2018, Price : Tk. 220 Only
e-mail : pearl_publications@yahoo.com

উ ৎ স র্গ

হাসি-খুশি রেবেকা-

যেখানে থাকে, সেখানেই আনন্দ!

ভূমিকা

আমি যখন টুনটুনি ও ছোটাচ্চু নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম তখন একবারও ভাবিনি যে এদের নিয়ে দ্বিতীয় একটি বই লেখা হবে। এখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করছি, শুধু দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় নয়, চতুর্থবারও লেখা হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, আমার এই লেখালেখি করার কারণ হচ্ছে পাঠকদের চাপ। পাঠকেরা যদি কমবয়সী শিশু-কিশোর হয়, তাদের চাপ অত্যন্ত কঠিন, সেখান থেকে বের হয়ে আসা সোজা কথা নয়!

আরো লিখতে হবে কি না জানি না—যদি লিখেও ফেলি, সেই বইয়ের নাম কীভাবে দেব?

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১১.১২.২০১৭

ফিরে এলো ছোটাচ্চু

দাদি (কিংবা নানি) বসে টেলিভিশনে একটা বাংলা সিরিয়াল দেখছেন, কাহিনি খুব জমে উঠেছে, শাশুড়ি বউকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে, ছেলে প্রতিবাদ না করে মুখ বন্ধ করে বসে আছে। সেই দৃশ্য দেখে দাদি অপদার্থ ছেলেটির উপর খুবই রেগে উঠছেন। কিন্তু তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না কারণ খুব কাছেই বাচ্চারা হুটোপুটি করে খেলতে খেলতে চিৎকার করছে।

দাদি একটা হুংকার দিয়ে বললেন, "এই! তোরা থামবি? তোদের যন্ত্রণায় এক মিনিট টেলিভিশনটাও ঠিক করে দেখতে পারি না।"

পাশেই বসে ঝুমু খালা দাদির পায়ে গরম তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল। গরম তেলে কী দিয়েছে কে জানে, দাদির শরীর থেকে শিক কাবাবের মতো একধরনের গন্ধ বের হচ্ছে। দাদির হুংকারের পর সেও একটা হুংকার দিল, "তোমরা কি চিল্লাফাল্লা থামাবা নাকি জরিনি বেওয়ার পানি-পড়া নিয়া আসুম?"

বাচ্চারা চিৎকার থামিয়ে ঝুমু খালার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। জরিনি বেওয়ার নাম তারা আগেও ঝুমু খালার কাছে শুনেছে, তার নানা রকম রহস্যজনক কাজকর্মের কথাও শুনেছে, পানি-পড়া দিয়ে কী হয় সেটা এখনো শুনেনি, তাই একজন জিজ্ঞেস করল, "জরিনি বেওয়ার পানি-পড়া দিয়ে কী হবে?"

ঝুমু খালা বলল, "খালি তোমাদের শরীরে একটা ছিটা দিমু, ব্যস, কথা বন্ধ। নো চিল্লা নো ফাল্লা।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? আমাগো গ্রামে দবির মিয়া হইল ডাকাইতের বাচ্চা ডাকাইত। মার্ডার কেসের আসামি, যখন কোর্টে মামলা উঠছে তখন হে জরিনি বেওয়ার এক শিশি পানি-পড়া নিয়া গেছে। জজ সাহেব ঠিক যখন রায় দিব তখন জজ সাহেবের দিকে পানি-পড়া ছিটায়ে দিছে! ব্যস, জজ সাহেবের জবান বন্ধ। দবির মিয়া বেকসুর খালাস।"

সবচেয়ে ছোটজন রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?

ঝুমু খালা বলল, “সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? আমাগো গ্রামে চলো, দবির মিয়ারে দেখামু। এখনো ডাকাইতের বাচ্চা ডাকাইত।”

আরেকজন বলল, “আমাকে এক শিশি পানি-পড়া এনে দেবে?”

ঝুমু খালা জানতে চাইল, “কী করবা?”

“আমাদের স্কুলে বিলকিস মিসের গায়ে ছিটা দিব।”

“কেন?”

“ক্লাসে বড় জ্বালায়। ক্যাটক্যাট করে খালি বকা দেয়।”

তখন সবাই একসাথে হই হই করে উঠল, “আমাকে এক শিশি– আমাকে এক শিশি–”

শান্ত বলল, “আমাকে এক বালতি।”

সবাই ঘুরে শান্তর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, “এক বালতি? এক বালতি দিয়ে কী করবে?”

শান্ত হাসি হাসি মুখে বলল, “বিজনেস! ছোট ছোট শিশিতে ভরে বিক্রি করব। এক শিশি একশ’ টাকা!”

শান্ত কীভাবে জরিনি বেওয়ার পানি-পড়া দিয়ে বিজনেস করবে সেটা শোনার আগেই সবাই দেখল ঘরে ছোট চাচা ঢুকছে। তার মুখ হাসি হাসি এবং হাতে একটা ব্যাগ।

সবাই হই হই করে উঠল, “ছোটাচ্চু, কী এনেছ? কী এনেছ?”

ছোটাচ্চুর মুখের হাসি আরো বড় হলো; বলল, “ফাটাফাটি জিনিস। এই দ্যাখ–” তারপর ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা মোটা বই বের করে আনল। চকোলেটের বাক্সের বদলে একটা বই, তাও সেটা ইংরেজিতে লেখা। দেখেই সবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল এবং একসাথে সবাই মিলে যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল। ছোটাচ্চু সেটা খেয়াল করল বলে মনে হলো না, বইটা উপরে তুলে বলল, “এই হচ্ছে সেই বই। মাদার অব অল বুকস।”

শান্ত জিজ্ঞেস করল, “ইংরেজি বই?”

ছোটাচ্চু বলল, “হ্যাঁ।”

“তুমি ইংরেজি বই পড়বে?”

ছোটাচ্চু একটু রেগে গিয়ে বলল, “হ্যাঁ, পড়ব। কোনো সমস্যা আছে?”

শান্ত বলল, “তুমি বাংলাই ভালো করে জানো না, ইংরেজি বই কেমন করে পড়বে?”

ছোটাচ্চু হুংকার দিল, “আমি বাংলা জানি না?”

শান্ত বলল, “মনে নাই, আমি গোসল করব না বললে তুমি বলো আমি গোসলাব–”

"বলি না। আমি কোনোদিন গোসলাব বলি না।"

"বলেছ। দাদি বলেছে।" শান্ত তখন তার দাদির দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদি, মনে আছে তুমি বলেছিলে ছোটাচ্চু ছোট থাকতে বলত আমি গোসলাব, বলত না দাদি?"

দাদি তার সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত। শাশুড়ি এখন বাড়ির বউয়ের চুল ধরে টানাটানি করছে, শান্তর কথা শোনার সময় নাই, তাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ বলত।"

শান্ত রাজ্য জয় করার ভঙ্গি করে বলল, "দেখেছ?"

"ছোট থাকতে কে কী বলে তার ঠিক আছে?"

শান্ত গম্ভীর মুখে বলল, "কারো যদি সমস্যা থাকে সেটা ছোট থাকতেই বোঝা যায়।"

মুনিয়া হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, "ছোটাচ্চু, ছবি আছে বইয়ে?"

ছোটাচ্চু থতমত খেয়ে বলল, "ছবি? ছবি দিয়ে কী হবে?"

"ছবি নাই?"

"না–মানে, এইটা তো পোলাপানের বই না যে ছবি থাকবে। এটা হচ্ছে কাজের বই।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

"এই তো কীভাবে বিজনেস বড় করতে হয়। ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্ট করতে হয়। প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হয়–"

একজন কানে হাত দিয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ ছোটাচ্চু তুমি এই খারাপ খারাপ কথাগুলো বোলো না, শুনলে গা শিরশির করে।"

আরেকজন বলল, "ছোটাচ্চুর কথা শুনে লাভ নাই। চকোলেটের বাক্স আনলে একটা কথা ছিল। আয় খেলি।" বলে সবাই খেলায় ফিরে গেল।

ছোটাচ্চু বইটা উপরে তুলে ধরেছিল; এবারে মনমরা হয়ে বইটা নিচে নামিয়ে বলল, "তোদের হয়েছেটা কী? দিন-রাত খাই খাই করিস। চকোলেট না আনলে কথাই শুনতে চাস না।"

কেউ ছোটাচ্চুর এই কথাটাও শুনল বলে মনে হয় না, সবাই হইচই করে খেলতে থাকল। দাদি একটু পরে আবার হুংকার দিলেন, "এই তোরা থামবি? থামবি একটু?"

ছোটাচ্চু যখন তার ঘরে গিয়ে জুতো খুলে বিছানায় বসেছে তখন টুনি গিয়ে ঢুকল, ছোটাচ্চু তাকে একনজর দেখে বলল, "কী হলো, কিছু বলবি?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"তাহলে?"

"তুমি যেটা বলতে চাইছিলে সেটা শুনতে এসেছি।"

ছোটাচ্চু মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি কিছু বলতে চাই নাই। তোদের মতো পোলাপানদের সাথে আমি কী বলব?"

টুনি মাথা নাড়ল; বলল, "ছোটাচ্চু, তোমার মুখ দেখেই সবকিছু বোঝা যায়। আজকে কিছু একটা হয়েছে, সে জন্যে তুমি খুব উত্তেজিত। তুমি কিছু একটা বলতে চাচ্ছ। কী হয়েছে বলো।"

"কিছু হয় নাই।"

"ছোটাচ্চু তুমি এই রকম মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়ার মানুষ না– তোমাকে কেউ একজন কিছু একটা বলেছে। কে বলেছে? কী বলেছে?"

ছোটাচ্চু টুনির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল এবং ধীরে ধীরে তার মুখে আবার হাসি ফিরে এলো, বলল, "আজকে আমার সাথে একজন দেখা করতে এসেছিল। তার নাম হচ্ছে সরফরাজ কাফি।"

"এটা আবার কী রকম নাম?"

"নাম তো নামই। স্কুলে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম ছিল মাগরা মাহিন্দি। যাই হোক সরফরাজ রীতিমতো এপয়েন্টমেন্ট করে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। এসে কি বলল জানিস?"

"কী বলল?"

"বলেছে আমার দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ভবিষ্যৎ একেবারে ফাটাফাটি ।এটাকে ঠিকমতো মার্কেটিং করতেপারলে–"

টুনি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "মার্কেটিং? মানে বেচা-কেনা?"

"আরে না, আলু-পটল বেচার মতো মার্কেটিং না। অন্য রকম মার্কেটিং। ব্র্যান্ডিং করা। সবাইকে জানানো–"

"সরফরাজ কাফি আর কী বলেছে?"

"বলেছে আমার এজেন্সির সব ঠিক আছে, শুধু ম্যানেজমেন্ট দুর্বল। ম্যানেজমেন্ট ঠিক করতে পারলে ধাঁই ধাঁই করে উঠে যাবে।

টুনি মুখ শক্ত করে বলল, "তোমাকে গায়ে পড়ে অপমান করে গেল আর তুমি কিছু বললে না?"

ছোটাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, "আরে ধুর। গায়ে পড়ে অপমান কেন হবে? নিজ থেকে আমাকে সাহায্য করতে চাইল। এত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ–"

"গুরুত্বপূর্ণ? তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে ফালতু টাইপ।"

"না, না। কী বলিস, ফালতু কেন হবে? তাদের বিশাল বড় ফার্ম, নূতন নূতন কোম্পানিকে দাঁড়া করিয়ে দেয়। আমাকে এই বইটা পড়তে দিয়েছে–" ছোটাচ্চু সেই ইংরেজি বইটা আবার দেখাল।

টুনি বইটা দেখার কোনো উৎসাহ দেখাল না। ছোটাচ্চু অবশ্যি উৎসাহ নিয়ে বইটা খুলে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "সরফরাজ কাফি বলেছে, আমাকে ম্যানেজমেন্টের সবকিছু শিখিয়ে দেবে। আমি কি ভাবছি জানিস?"

"কী ভাবছ?"

"আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি তো বড় হচ্ছে, আমার আরো লোক দরকার। আমি নিজে বড় বড় ডিটেকটিভ কাজগুলো করব। আর অফিসিয়াল কাজের জন্যে একজন লোক নিয়ে নিব। সরফরাজ যদি পার্টটাইম কাজ করতে রাজি থাকে–"

টুনি ছোটাচ্চুকে কথার মাঝখানে থামিয়ে বলল, "খবরদার ছোটাচ্চু! তুমি এই লোককে নেবে না।"

ঠিক তখন সবগুলো বাচ্চা ছোটাচ্চুর ঘরে ঢুকল। ঢোকার সময় তারা শুধু টুনির কথাটা শুনেছে, আগে-পিছে কিছুই জানে না, কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা হলো না, প্রায় সবাই মিলে একসাথে বলল, "না ছোটাচ্চু, তুমি এই লোককে নেবে না।"

শান্ত তারপর গলা নামিয়ে টুনিকে জিজ্ঞেস করল, "কোন লোক টুনি? এই লোক কী করেছে?"

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোরা কী চাস? এখানে কেন এসেছিস?"

একজন বলল, "বেশি চেঁচামেচি করছিলাম দেখে দাদি বের করে দিয়েছে। আমরা অবশ্যি এমনিতেই তোমার কাছে আসছিলাম।"

"কী জন্যে আসছিলি?"

"সবকিছু শোনার জন্যে। তোমার মাদারী মাদার বইটা দেখার জন্যে।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "মাদারী মাদার না–বইটা হচ্ছে মাদার অব অল বুকস।"

"একই কথা।"

ছোটাচ্চু গরম হয়ে বলল, "মোটেও একই কথা না।"

শান্ত টুনিকে আবার জিজ্ঞেস করল, "টুনি, তুই কোন লোককে নিতে না করছিস?"

"একজন মানুষ, তার নাম সরফরাজ কাফি। ছোটাচ্চুর আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ঢুকতে চাচ্ছে।"

"কী নাম বললি?"

"সরফরাজ কাফি।"

"এটা আবার কী রকম নাম? এই নামের লোককে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে না।" শান্ত ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ছোটাচ্চু, টুনি ঠিকই বলেছে, এই লোককে তোমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ঢোকানো যাবে না।"

ছোটাচ্চু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তোরা এখন বিদায় হবি? বিদায় হবি এখন থেকে? একেবারে পাগল-ছাগলের হাতে পড়েছি।"

শান্ত বলল, "আয় যাই। আজকে যেখানেই যাচ্ছি সেখান থেকেই সবাই আমাদের বের করে দিচ্ছে। এই বাসায় মানুষজন কেমন জানি নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে।"

*   *   *

দুই দিন পর রাত্রিবেলা কলিংবেল বাজল। শান্ত দরজা খুলে দেখল স্যুট-টাই পরা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির মাথার চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে, তাই মাথার মাঝখানে সিঁথি করে চুলগুলো দুই ভাগ করে টাক-মাথাটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। মানুষটা হাসি হাসি মুখ করে বলল, "শাহরিয়ার সাহেব আছেন?"

শান্তর কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে শাহরিয়ার মানুষটা কে, তখন তার মনে পড়ল ছোটাচ্চুর ভালো নাম হচ্ছে শাহরিয়ার। সে স্যুট-টাই পরা মানুষটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ছোটাচ্চুকে ডেকে আনতে গেল।

ছোটাচ্চু বাইরের ঘরে এসে মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "আরে–সরফরাজ সাহেব! আপনি? আমার বাসায়?"

সরফরাজ নামের মানুষটা উঠে ছোটাচ্চুর হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "আমি নিজেই চলে এসেছি। ভাবলাম শুভকাজে দেরি করে কী লাভ? কাগজপত্র নিয়ে এসেছি, আপনার সিগনেচার নিয়ে যাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "আপনার নিজের তো আসার দরকার ছিল না। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন!"

"না, না, আবার কাকে পাঠাব? নিজেই চলে এসেছি। যেহেতু এখন আপনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে তাই ভাবলাম বাসাটা চিনে যাই!"

শান্ত ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে ছিল। ছোটাচ্চু বলল, "শান্ত, তুই হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? যা, ভিতরে যা।"

শান্ত ভিতরে গেল, তারপর সবাইকে খবর দিল সরফরাজ কাফি নামের মানুষটা তাদের বাসায় চলে এসেছে, বাইরের ঘরে সোফায় বসে আছে। ছোটাচ্চুর কাছ থেকে কীসের জানি সিগনেচার নেবে।

তখন সবাই ছুটে গেল মানুষটাকে দেখার জন্যে, বাইরের ঘরের জানালার পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে টুম্পা ফিসফিস করে বলল, "মানুষটা ভালো না।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে জানিস?"

"দেখছ না স্যুট-টাই পরে আছে। গরমের মাঝে যারা স্যুট-টাই পরে থাকে, তারা মানুষ ভালো না।"

মুনিয়া বলল, "তাছাড়া মোছটাও ভালো না।

"মোছ ভালো না মানে কী?"

"দেখছ না কত চিকন মোছ! চিকন মোছ মানেই সমস্যা।"

সবাই যখন ভিড় করে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরফরাজ কাফিকে দেখছে তখন ঝুমু খালা হেঁটে যাচ্ছিল, সবাইকে জানালার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, "কী দেখো তোমরা?"

টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চুর সাথে দেখা করতে একটা লোক এসেছে। লোকটা ভালো না খারাপ সেটা দেখছি।"

ঝুমু খালা বলল, "মানুষের চেহারা দেখে ভালো-খারাপ বোঝা যায় না। ফিরেশতার মতোন চেহারা কিন্তু আসলে ইবলিশ–এইরকম মানুষ আছে। আবার ইবলিশের মতোন চেহারা কিন্তু আসলে ফিরেশতা–এইরকম মানুষও আছে। মানুষের ভালো-খারাপ বোঝার জন্য অন্য নিয়ম আছে।"

"সেইটা কী?"

"পান-পড়া। পানের উপর খাঁটি সরিষার তেল লাগায়া সেটার উপর তিনবার ফুঁক দিতে হয়। ফুঁক দেয়ার সময় বলতে হয় ভালায় ভালা, মন্দে কালা। তারপর সেই পানটা মানুষের কপালে ডলে দিতে হয়। মানুষটা ভালো হলে কিছু হবে না। মন্দ হলে কপাল থেকে কালা রং বের হবে। পানটা হবে কুচকুচা কালা–"

শান্ত বলল, "এই টেকনিক খুব ডেঞ্জারাস। মানুষটা মনে হয় তার কপালে পান-পড়া ডলতে দিবে না।"

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "সোজা নিয়ম নাই ঝুমু খালা?"

ঝুমু খালা চোখ বন্ধ করে উপরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "আছে একটা সহজ উপায়।"

"কী?"

"চায়ের মাঝে চিনির বদলে লবণ দিয়া দিমু। যদি মানুষটা ভালো হয়, মগজের মাঝে দুই নম্বরি বুদ্ধি না থাকে, তাহলে চা মুখে দিয়েই বলবে, হায়, হায়, চায়ের মাঝে দেখি লবণ! আর মানুষটা যদি দুই নম্বর হয়, যদি বদমতলব থাকে তাহলে টুঁ শব্দ না কইরা চা'টা খায়া ফেলব।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি!"

"ঝুমু খালা, তাহলে তাড়াতাড়ি লবণ দেওয়া চা নিয়ে আসো। প্লিজ।"

"ঠিক আছে।"

ঝুমু খালা তখন চা আনতে গেল। কিছুক্ষণের মাঝেই চা আর সাথে গরম গরম ভাজা ডালপুরি নিয়ে ঝুমু খালা বসার ঘরে হাজির হলো। ছোটাচ্চুর সামনে চিনি দেওয়া চা, সরফরাজ কাফির সামনে লবণ দেয়া চা আর দুইজনের মাঝখানে ডালপুরির প্লেট রেখে ঝুমু খালা চলে এলো। তারপর ঝুমু খালাও অন্যদের সাথে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল এখন কী হয়।

ছোটাচ্চু কাগজপত্রে সাইন করছিল, ঝুমু খালার তৈরি স্পেশাল ডালপুরি দেখে কাগজপত্র সরিয়ে রেখে ডালপুরি খেতে শুরু করল। সরফরাজ কাফি অর্ধেকটা ডালপুরি ভেঙে নিয়ে একটুখানি খেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিল। সবাই দেখল কাপে চুমুক দিতেই তার মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে, কাপটা মুখ থেকে সরিয়ে অবাক হয়ে সে কিছুক্ষণ কাপের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোটাচ্চু অবশ্য কিছুই লক্ষ করল না, গভীর মনোযোগ দিয়ে একটার পর একটা ডালপুরি খেয়ে যেতে লাগল। ডালপুরি ছোটাচ্চুর খুবই প্রিয়।

জানালার পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে সবাই তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সরফরাজ কাফি এখন কী করে। প্রথমে মনে হলো বুঝি কাপটা নামিয়ে রাখবে। শেষ পর্যন্ত নামিয়ে রাখল না। একবার আড়চোখে ছোটাচ্চুকে দেখে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বিস্বাদ-লবণাক্ত চা খেতে লাগল।

ঝুমু খালা বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হাতে কিল দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এই লোক দুই নম্বুরির ছাওয়াল চাইর নম্বুরি। মাথার মাঝে বদমতলব। রগে রগে বদমাইশি। এর থেকে একশ' হাত দূরে থাকন দরকার।"

সরফরাজ কাফি কাজ শেষ করে যখন চলে যাচ্ছে ঝুমু খালা তখন ট্রেতে করে খালি কাপ-প্লেট তুলে আনতে আনতে জিজ্ঞেস করল, "চা-নাশতা ঠিক ছিল আঙ্কেল?"

সরফরাজ কাফি এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো ছিল। খুব ভালো ছিল। থ্যাংকু।"

ঝুমু খালা বলল, "পরের বার যখন আসবেন তখন আরো ভালো চা-নাশতা দিব।"

সরফরাজ কাফি কোনো কথা না বলে চোখ ছোট ছোট করে ঝুমু খালার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছোটাচ্চু তার নিজের ঘরে পৌঁছানোর আগেই সবগুলো বাচ্চা তার ঘরে হামলা করল।

একজন বলল, "ছোটাচ্চু কাজটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কোন কাজটা?"

"এই যে একজন দুই নম্বরি মানুষকে তোমার সাথে নিচ্ছ।"

ছোটাচ্চু রেগে বলল, "কী রকম বেয়াদপের মতো কথা বলছিস! একজন সম্মানী মানুষ নিজ থেকে আমাকে সাহায্য করার কথা বলছে আর তোরা ঘ্যানঘ্যান করছিস?"

"তুমি হচ্ছ আমাদের ছোটাচ্চু–তোমাকে আমরা কিছু বলতে পারব না?"

"পারবি না কেন? একশ'বার পারবি। কিন্তু বড়দের ব্যাপারে তোরা নাক গলাচ্ছিস কেন? তোরা এসবের কিছু বুঝিস না জানিস?"

প্রমি মুখ শক্ত করে বলল, "একটা জিনিস জানি আর বুঝি।"

"কী জিনিস?"

মুনিয়া বলল, "এই মানুষটা দুই নম্বুরির ছাওয়াল চাইর নম্বুরি।"

ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললি! কী বললি তুই?"

ঝুমু খালার বাক্যটা দ্বিতীয়বার বলা ঠিক হবে না ভেবে মুনিয়া চুপ করে গেল।

টুম্পা বলল, "আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি মানুষটা খারাপ।"

"কীভাবে পরীক্ষা করেছিস?"

ঝুমু খালার লবণ-চা পরীক্ষার কথা বললে ঝুমু খালা বিপদে পড়ে যেতে পারে বলে কেউ পরীক্ষার পদ্ধতিটা নিয়ে কথা বলল না। মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটাচ্চু বলল, "তোরা এখন বিদায় হ। আমার এই কাগজগুলো পড়তে হবে।"

সরফরাজ কাফি ছোটাচ্চুকে পড়ার জন্যে বান্ডিল বান্ডিল কাগজ দিয়ে গেছে; ছোটাচ্চু কাগজগুলো সবাইকে দেখাল। তারপর আঙুল দিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল, ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট–সবাই যেন বের হয়ে যায়। বাচ্চাগুলো তখন একজন একজন করে বের হয়ে গেল। টুনি বের হলো সবার শেষে, কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না।

আধা ঘণ্টা পর টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল ছোটাচ্চু কাগজের বান্ডিলের উপর মাথা রেখে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। ছোট ছোট অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা বান্ডিল বান্ডিল কাগজ ছোটাচ্চুর পক্ষে পড়া সম্ভব না। ঠিক কী কারণ জানা নেই। টুনির ছোটাচ্চুর জন্যে একটু মায়া হলো।

* * *

পরদিন সকালে ছোটাচ্চু তার দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে গিয়ে দেখে রঞ্জনা কেমন যেন হতচকিত ভঙ্গিতে বসে আছে। ছোটাচ্চু বলল, "কী খবর রঞ্জনা?"

রঞ্জনা বলল, "না মানে ইয়ে–" কিন্তু বাক্যটা শেষ করল না, কেমন যেন ভ্যাবাচেকার ভঙ্গি করে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু একটু অবাক হয়ে তার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। অফিসে তার বড় ডেস্কটার পিছনে তার গদি-আঁটা চেয়ারে সরফরাজ কাফি বেশ আয়েশ করে বসে আছে। সামনে একটা ফাইল; সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ছোটাচ্চু যতটুকু বিরক্ত হলো অবাক হলো তার থেকে বেশি। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল, ধরে নিল সরফরাজ কাফি তাকে দেখে চেয়ারটা ছেড়ে দেবে।

সরফরাজ কাফি চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোনো নিশানা দেখাল না, হাসি হাসি মুখে বলল, "এই যে শাহরিয়ার সাহেব। গুড মর্নিং!"

ছোটাচ্চু গুড মর্নিংয়ের উত্তর না দিয়ে বলল, "মানে–আপনি আমার চেয়ারে?"

সরফরাজ কাফি এমনভাবে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল যে দেখে মনে হলো সে ছোটাচ্চুর কথা বুঝতে পারছে না। একটু অবাক হয়ে বলল, "আ-আপনার চেয়ার?"

"হ্যাঁ। এইটা আমার অফিস। আমার ডেস্ক। আমার চেয়ার।"

সরফরাজ কাফির হাসি আরো বিস্তৃত হলো, ছোটাচ্চুকে সামনে বসার ইঙ্গিত করে বলল, "কিন্তু আমরা যে কাল রাতে কন্ট্রাক্ট করলাম? আপনি ফিল্ড লেভেলে কাজ করবেন, আমি ম্যানেজমেন্ট দেখব। আপনি যেহেতু ফিল্ডে কাজ করবেন, কোনো অফিসের দরকার নেই, আমি এই অফিসে বসব।"

ছোটাচ্চুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "ক-কন্ট্রাক্টে তাই লেখা ছিল?"

"হ্যাঁ। আপনাকে একটা কপি দিয়ে এসেছি, পড়েননি?"

ছোটাচ্চু তার পায়ে জোর পাচ্ছিল না, কোনোভাবে একটা চেয়ারে বসে বিড়বিড় করে বলল, "কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।"

সরফরাজ কাফি জোরে জোরে মাথা নাড়ল; বলল, "না, না, গোলমাল হবে কেন? আমি আর আপনি মিলেই তো সবকিছু ঠিক করেছি। এই যে আমি ফাইল নিয়ে বসেছি। ফাইলে লেখা দশটার সময় আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে পুরান ঢাকায়। এখন বাজে সাড়ে নয়টা, এক্ষুনি বের হয়ে যান, তা না হলে সময়মতো পৌঁছাতে পারবেন না।" সরফরাজ কাফি তারপর গলা উঁচিয়ে ডাকল, "রঞ্জনা, শাহরিয়ার সাহেবকে একটা স্লিপ দাও। ফিরে আসার পর খরচের ভাউচার নিতে ভুলে যেও না।"

সরফরাজ কাফি আবার হাসি হাসি মুখে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, তারপর গলা নামিয়ে বলল, "শাহরিয়ার সাহেব, আপনাকে আরো একটা জিনিস বলি। এত দিন আপনি এই এজেন্সিটাকে যেভাবে খুশি সেভাবে চালিয়েছেন, এখন যেহেতু আমি দায়িত্ব নিয়েছি, এখন এটাকে যেভাবে খুশি সেভাবে চালানো যাবে না। একটা নিয়মের ভিতর আসতে হবে, শৃঙ্খলার ভিতর আসতে হবে। যেমন ধরেন, অফিসের টাইম হচ্ছে নয়টা, আপনি এসেছেন সাড়ে নয়টায়–ভবিষ্যতে এটা হতে পারবে না। তারপর ধরেন আপনার পোশাক–একটা টি-শার্ট পরে চলে এসেছেন, এটাও ঠিক হয় নাই। কমপক্ষে ফুল হাতা শার্ট আর টাই। এখন টাইয়ের ফ্যাশন হচ্ছে চওড়া; চিকন একটা টাই পরে চলে আসবেন না যেন–"

এ রকম সময় ছোটাচ্চু বিকট আঁ আঁ শব্দ করে সরফরাজ কাফির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথম ঘুষিটা লাগাতে পারল না, তবে দ্বিতীয়টা ঠিক ঠিক লাগল এবং সরফরাজ কাফি চেয়ারসহ পিছন দিকে পড়ে গেল। ছোটাচ্চু লাফ দিয়ে সরফরাজ কাফির বুকের উপর বসে তার টাইটা টেনে বলল, "তবে রে দুই নম্বুরির ছাওয়াল চাইর নম্বুরি–"

সরফরাজ কাফি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, "হেল্প! হেল্প!!"

চিৎকার শুনে রঞ্জনা এসে পিছন থেকে ছোটাচ্চুকে ধরে কোনোমতে টেনে সরিয়ে আনল।

রাত্রিবেলা বাসায় খুবই উত্তেজনা। অনেক দিন পর বাসায় এ রকম উত্তেজনা হয়েছে। ছোটাচ্চু একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে আছে। তার মোটামুটি বিধ্বস্ত চেহারা। বড় চাচা ঘরে পায়চারি করছেন, একটু আগে অনেক কষ্ট করে বড় চাচা ছোটাচ্চুকে হাজত থেকে ছুটিয়ে এনেছেন। ছোটাচ্চুর হাতে মার খেয়ে সরফরাজ কাফি তার কোম্পানিকে ফোন করেছে, কোম্পানি ফোন করেছে পুলিশকে। পুলিশ এসে ছোটাচ্চুকে ধরে হাজতে নিয়ে গেছে। বড় চাচার সাথে পুলিশের বড় অফিসারের পরিচয় আছে, তা না হলে কী হতো কে জনে!

দাদি (কিংবা নানি) অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে সতেরো-বারের মতো বললেন, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমার ছেলে মারপিট করে জেলহাজতে গেছে। আমার ছেলে? যে ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি, সে মানুষের সাথে মারপিট করে জেলহাজতে যায়?"

দাদি যেটাই বলে ঝুমু খালা সবসময়ই সেটা বলে, এই প্রথমবার তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সে গলা উঁচিয়ে বলল, "এইটা আপনি কী বলেন খালা? জেলহাজত কেন–দরকার হলে আপনার ছেলে কালাপানিতে যাবে–কিন্তু চোর-ছ্যাঁচড়-বান্দরের বাচ্চাদের পিটায়া সাইজ করবে না?"

ঝুমু খালা তারপর ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইজান, আপনি এই বদমাইশের বাচ্চাকে আচ্ছামতন দুইটা দিছেন তো? ঘুষি মাইরা নাকের হাড্ডিটা ভাইঙা দিছেন তো?"

বড় চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, "ঝুমু। তুমি থামবে? কী সব কথা বলছ? ছিঃ।"

ঝুমু খালা থামার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বলল, "আপনি কী বলেন বড় ভাইজান, আমি যে খালি ঘরে বইসা তড়পাচ্ছি, এইটা ওই বান্দরের বাচ্চার সাত পুরুষের ভাগ্য! ছোট ভাইজানরে সোজা-সরল মানুষ পাইয়া হাজতে দেয়–আমার সাথে তেড়িবেড়ি করতে আসত, আমি গিয়া খাবলা দিয়া চোখ দুইটা তুইলা আনতাম।"

বড় চাচা হাল ছেড়ে দিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন কী অবস্থা?"

ছোটাচ্চু পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বড় চাচার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমাকে আমার ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে বের করে দিয়েছে।"

ঘরের সবাই চমকে উঠল! বড় চাচা বললেন, "কী বলছিস? তোকে তোর কোম্পানি থেকে বের করে দিয়েছে?"

ছোটাচ্চু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "এটা এখন আর আমার কোম্পানি না। ঐ পাজি মানুষটা আমাকে দিয়ে কী সব কাগজ সাইন করিয়ে নিয়েছিল, আমি বুঝি নাই–এখন অফিসিয়ালি আমি ডিটেকটিভ এজেন্সির কেউ না। সবকিছুর মালিক সরফরাজ কাফির কোম্পানি।"

বড় চাচা হুংকার দিয়ে বললেন, "এটা কী মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি যে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলবে?"

বড় চাচা খুবই শান্ত মানুষ, কেউ তাকে কোনোদিন গলা উঁচিয়ে কথা বলতে শুনে নাই। তাই হঠাৎ করে বড় চাচা যখন হুংকার দিলেন, তখন সবাই অবাক হয়ে বড় চাচার দিকে তাকিয়ে রইল। বড় চাচা কী বলছেন কেউ শুনছে না, কীভাবে বলছেন সেটাই সবাই দেখছে।

বড় চাচা হাত-পা নেড়ে বললেন, "আমার পরিচিত সুপ্রিমকোর্টের ল'য়ার আছে, আমি মামলা করে দেব–"

ছোটাচ্চু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না ভাইজান। আমার মামলা করার ইচ্ছা নাই। যা হবার হয়েছে–আমি এর মাঝে আর নাই।"

তারপর কাউকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে ছোটাচ্চু নিজের ঘরের দিকে হেঁটে যেতে থাকল। বড় মানুষ কেউ তার সাথে গেল না কিন্তু বাচ্চারা সবাই দলবেঁধে তার পিছু পিছু গেল।

ছোটাচ্চু তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। টুনি নরম গলায় ডাকল, "ছোটাচ্চু–"

ছোটাচ্চু টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু বলবি?"

"তোমার কি মন খারাপ ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "এখন মনটা কাজ করছে না, থেমে আছে। তাই বুঝতে পারছি না। যখন মনটা কাজ করতে শুরু করবে তখন বুঝতে পারব।"

"তুমি মন খারাপ কোরো না ছোটাচ্চু।"

তখন সবাই একসাথে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ ছোটাচ্চু, মন খারাপ কোরো না। প্লিজ ছোটাচ্চু–প্লিজ। তুমি মন খারাপ করলে আমাদেরও মন খারাপ হবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, মন খারাপ করব না।" একটু থেমে বলল, "আসলে তোরা ঠিকই অনুমান করেছিলি যে সরফরাজ মানুষটা বদ।"

একজন বলল, "বদের লাঠি।"

আরেকজন বলল, "পাজির পা ঝাড়া।"

আরেকজন বলল, "খাটাসের বাচ্চা খাটাস।"

তখন সবাই মিলে সরফরাজ কাফিকে গালিগালাজ শুরু করল। সে কী গালিগালাজ! মনে হলো গালিগালাজের তাপে ঘরে বুঝি আগুন ধরে যাবে।

গালাগাল একটু কমে আসার পর টুনি আবার ছোটাচ্চুকে ডাকল, "ছোটাচ্চু।"

"বল।"

"তোমাকে একটা কথা বলি?"

"বল।"

"তোমাকে যদি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিটা ফিরিয়েও দেয় তুমি সেটা নিয়ো না।"

ছোটাচ্চু একটু অবাক হয়ে বলল, "নিব না?"

"না।"

"কেন?"

"বড় অফিস নেওয়ার পর তুমি অন্য রকম হয়ে গেছ। তোমার সাথে আমাদের আর দেখা হয় না। মনে আছে আগে কত মজা হতো? সবসময় তুমি আমাদের সাথে থাকতে!"

অন্য সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আমাদের সাথে থাকতে আর আমাদের কত মজা হতো।"

একজন বলল, "মনে আছে একবার একটা ছাগলকে রং করে দিয়েছিলে?"

আরেকজন বলল, "তারপর আমরা নাটক করলাম?"

আরেকজন বলল, "আর ওই যে একবার রাজাকার টাইপের নানা যখন এসেছিল তখন রাত্রে ভূতের ভয় দেখানো হলো।"

আরেকজন বলল, "তারপর একটা দেওয়াল পত্রিকা বের করলাম? ভৌতিক সংখ্যা?"

আরেকজন বলল, "শান্ত ভাইয়া যখন স্কুলে ঝামেলায় পড়ল তুমি গার্জিয়ান সেজে গিয়ে শান্ত ভাইয়াকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে।"

আরেকজন বলল, "স্কুলের স্পোর্টসের দিন তুমি আমাকে ডাইনি বুড়ি সাজিয়ে দিলে মনে আছে?"

আরেকজন বলল, "আমার সায়েন্স ফেয়ারের প্রজেক্টের জন্যে তুমি জোঁক ধরে আনলে মনে আছে?"

আরেকজন বলল, "সায়েন্স টিচারকে সেই জোঁক কামড়ে ধরল, আর সায়েন্স টিচার চিৎকার করে সবকিছু উল্টাপাল্টা করে ফেলল?"

মুনিয়া তখন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এখন তুমি কিছু কোরো না।"

ছোটাচ্চু সবার দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

টুনি বলল, "তুমি আবার আগের মতো হয়ে যাও।"

"সেটা কী রকম?"

"ওই তো–"

"ওই তো মানে কী?"

"আগের মতোন–পুরোপুরি অপদার্থ।"

ছোটাচ্চু হেসে ফেলল, আর তাকে হাসতে দেখে অন্য সবাই হি হি করে হাসতে থাকল। হাসি আর থামতেই চায় না।

ছোটাচ্চুর ঘর থেকে বের হয়ে শান্ত নিচু গলায় বলল, "সরফরাজ কাফিকে সাইজ করতে হবে।"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে সাইজ করবে ভাইয়া?'

"এখন বলব না।"

টুনি ভুরু কুঁচকে বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার মাথা গরম, কী না কী করে ফেলবে, আরো বড় ঝামেলা হবে।"

শান্ত বলল, "হলে হবে। শুধু সরফরাজ কাফির টেলিফোন নম্বরটা দরকার।"

টুনি বলল, "সর্বনাশ! টেলিফোন করলে আরো বিপদে পড়বে–"

"আমি টেলিফোন করব না।"

"তাহলে?"

"এখন বলব না।" বলে শান্ত আবার ছোটাচ্চুর ঘরে ঢুকে গেল। ছোটাচ্চু বাথরুমে গোসল কতে ঢুকেছে, টেবিলে তার মোবাইল ফোন রেখে গেছে। সেখান থেকে খুব সহজেই সরফরাজ কাফির মোবাইল নম্বর পাওয়া গেল।

একটু পরেই শান্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল, যাবার আগে সে ঝুমু খালার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে গেল। এই রাত্রিবেলা শান্ত কোথায় গেছে, কী করবে সেগুলো নিয়ে টুনি খুবই দুশ্চিন্তার মাঝে ছিল কিন্তু আধা ঘণ্টার মাঝেই শান্ত ফিরে এলো। কোথায় গিয়ে কী করেছে কিছুই সে বলল না।

পরদিন স্কুলে যাবার সময় বাচ্চারা দেখল বড় রাস্তার মোড়ে নূতন একটা বিল্ডিংয়ের ধবধবে সাদা দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখা :

"পাঁচশ' টাকার নোট একশ' টাকায়"

তার নিচে একটা টেলিফোন নম্বর।

লেখাটির সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত যখন সবার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল তখন সবাই বুঝে গেল যে এটা শান্তর কাজ, এবং নিচের নম্বরটি সরফরাজ কাফির।

টুনি জিজ্ঞেস করল, "এটা তুমি লিখেছ?"

"নিজে লিখি নাই। একজনকে পঞ্চাশ টাকায় সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। ব্যাটার হাতের লেখা ভালো না।"

শান্তর এই প্রজেক্ট কাজে লেগেছে কি না বোঝা গেল না।

ছোটাচ্চু দুই দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটাল। তৃতীয় দিন দরজা খুলে বের হয়ে এলো। বাচ্চারা আশেপাশেই ছিল, তারা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। মুনিয়া ছোটাচ্চুর হাত ধরে বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি শেভ করো নাই, বিন্দি বিন্দি দাড়ি বের হয়েছে।"

ছোটাচ্চুকে অবশ্য তার বিন্দি বিন্দি দাড়ি নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতে দেখা গেল না; ভুরু কুঁচকে বলল, "এই মাত্র আমাকে ডিবি পুলিশ ফোন করেছে।"

বাচ্চারা ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"জানতে চাইছে আমি সরফরাজ কাফিকে কতদিন থেকে চিনি, ওই ব্যাটা জাল নোটের ব্যবসা করে এ রকম কিছু আমি জানি কি না।"

শান্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, "ইয়েস!"

ছোটাচ্চু তার গালের বিন্দি বিন্দি দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "পুলিশ ব্যাটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। রিমান্ডে নিবে কি না বুঝতে পারছে না।"

এবারে শান্তর সাথে আরো অনেকে হাতে কিল দিয়ে বলল, "ইয়েস!"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তুমি পুলিশকে কী বলেছ?"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি বলেছি ব্যাটা জাল নোটের ব্যবসা করে কি না জানি না তবে মানুষটা পুরাপুরি দুই নম্বুরি তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমাকে ঠকিয়ে আমার এজেন্সি লিখে নিয়েছে।"

এবারে সবাই হুংকার দিয়ে বলল, "ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক!"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ব্যাটা মনে হয় বিপদে পড়েছে। আমাকে একটু পরে পরে ফোন করছে। আমি ফোন ধরছি না–"

সবাই বলল, "হ্যাঁ, ধরবে না ফোন। কক্ষনো ধরবে না।"

ছোটাচ্চু তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বাথরুমে ঢুকে গেল, মনে হয় বিন্দি বিন্দি দাড়ি শেভ করে ফেলবে।

ঝুমু খালার ধার শোধ করার জন্য শান্ত যখন সবার কাছ থেকে চাঁদা চাইল সবাই তখন উদারভাবে শান্তকে চাঁদা দিল। কিছুক্ষণেই পঞ্চাশ টাকা থেকে বেশি টাকা উঠে গেল, শান্ত ঝুমু খালাকে তার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাকিটা সার্ভিস চার্জ হিসেবে নিজের পকেটে রেখে দিল।

অন্য যেকোনো সময় এ রকম কিছু হলে বাচ্চারা চেঁচামেচি, হইচই করে তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলত–এবারে কেউ সেটা নিয়ে কিছু করল না। এ রকম একটা সফল প্রজেক্টের জন্যে শান্ত কিছু সার্ভিস চার্জ নিতেই পারে।

সন্ধেবেলা বাসার ছাদে ছোটাচ্চু তার মাদার অব অল বুকসটাকে পুড়িয়ে কেতলিতে পানি গরম করে চা বানাল। সবাই সেই চায়ের ভাগ পেল–মুনিয়াকে পর্যন্ত বেশি দুধ-চিনি দিয়ে আধা কাপ চা দেওয়া হলো।

মনে হচ্ছে ছোটাচ্চু আবার আগের ছোটাচ্চু হয়ে যাচ্ছে। কাজ নাই, কর্ম নাই এবং পুরোপুরি অপদার্থ।

BOILOVERS.COM

PRESENT

মোশতাক আহমেদ এর লিলিপুট সিরিজ পাবেন

http://www.boilovers.com/index.php?forums/78/

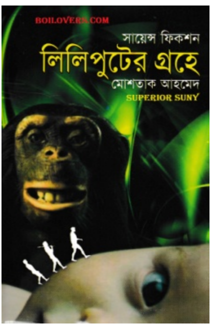

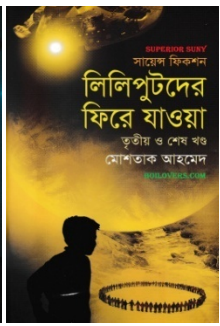

- লিলিপুটের গ্রহে
- পৃথিবীতে লিলিপুটেরা
- লিলিপুটদের ফিরে যাওয়া

জাল নোট

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে টুম্পা দেখল তাদের বাসার সামনে একটা সাদা গাড়ি এসে থেমেছে। গাড়িটার পিছনে একটা পুলিশের ভ্যান, সেখানে অনেক পুলিশ। সাদা গাড়িটা থেকে একজন মানুষ নামল, সে এদিক-সেদিক তাকাল তারপর তাদের বাসার ভিতরে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পরেই দরজায় টুং-টাং বেল শোনা গেল।

টুম্পা ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে দেখল ছোটাচ্চু বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের কোম্পানি থেকে নিজের চাকরি যাওয়ার পর থেকে ছোটাচ্চু বেশিরভাগ সময় এইভাবে শুয়ে থাকে।

টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চু বাসার সামনে একটা পুলিশের গাড়ি থেমেছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "গুড।"

"একজন মানুষ আমাদের বাসায় ঢুকেছে।"

ছোটাচ্চু উপরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ভেরি গুড।"

"মনে হয় তোমার কাছে এসেছে।"

"ভেরি ভেরি গুড।"

"তুমি যাবে না দেখা করতে?"

ছোটাচ্চু এবারে টুম্পার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "কী বললি?"

"বলেছি তুমি দেখা করতে যাবে না?"

"কার সাথে দেখা করতে যাব না?"

"তুমি আমার কথা শুনোনি?"

ছোটাচ্চু পালটা জিজ্ঞেস করল, "তুই কি আমাকে কিছু বলেছিস?"

"হ্যাঁ, বলেছি, তুমি কিছুই শুনোনি।"

টুম্পা কী বলেছে সেটা আবার বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শান্ত এসে বলল, "ছোটাচ্চু, তোমার সাথে ডি.এম.পি.র পুলিশ কমিশনার দেখা করতে এসেছেন।"

ছোটাচ্চু বিছানা থেকে উঠে বসে বলল, "আমার কাছে? আমার কাছে কেন?"

শান্ত বলল, "তুমি কোনো ক্রাইম করেছ?"

"আমি কেন ক্রাইম করব?"

"ক্রাইম করে থাকলে বলতাম তোমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে। না করলে কেন এসেছে আমি জানি না।"

ছোটাচ্চু আজকাল দাড়ি কাটে না, তাই তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছোটাচ্চু গালে হাত বুলিয়ে বলল, "এইভাবে যাব?"

শান্ত বলল, "হ্যাঁ। মুখে বিন্দি বিন্দি দাড়ি থাকা হচ্ছে স্টাইল। পুলিশ কমিশনার মনে করবে তুমি স্টাইলিস্ট।"

ছোটাচ্চু তাই সেভাবেই গেল, বাইরের ঘরে পুলিশ অফিসার ছোটাচ্চুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। ছোটাচ্চুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "শাহরিয়ার সাহেব?"

"জি।" বলে ছোটাচ্চু হাত মিলিয়ে সোফায় বসে পড়ল। পুলিশ অফিসার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমরা একটা কাজে আপনার কাছে এসেছি।"

"আমার কাছে?"

"জি। আমরা আসলে প্রথমে আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কাছে গিয়েছিলাম।"

ছোটাচ্চু তখন সোজা হয়ে বসল; বলল, "তাই নাকি?"

"জি। দেখলাম নতুন ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু সেখানে আপনি নাই।"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "না, আমি নাই।"

"আপনার নিজের হাতে তৈরি করা কোম্পানি কিন্তু আপনি কেন নাই বুঝতে পারলাম না।"

ছোটাচ্চুর বলতে লজ্জা লাগল যে তাকে তার নিজের কোম্পানি বের করে দিয়েছে, সেই জন্যে নাই। তাই জোর করে চেষ্টা করে মুখটা হাসি হাসি বানিয়ে বসে রইল। পুলিশ অফিসার বলল, "প্রথমে ভেবেছিলাম আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সাথেই আলাপ করি কিন্তু পরে মনে হলো যেখানে আপনি নাই সেই কোম্পানির সাথে আলাপ করে লাভ নাই।"

ছোটাচ্চুর চোখে-মুখে এবারে একটু উত্তেজনা দেখা দিল, বলল, "তাই ভাবলেন?"

"জি। সেই জন্যে আমরা খোঁজাখুঁজি করে আপনার কাছে চলে এসেছি।"

ছোটাচ্চু এবারে আরেকটু উত্তেজিত হলো। বলল, "আচ্ছা!"

"আপনার একটু সাহায্য দরকার।"

"আমার?"

"হ্যাঁ, আপনার।"

ছোটাচ্চু তার বিন্দি বিন্দি দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কিন্তু, আমি ভেবেছিলাম ডিটেকটিভের কাজ ছেড়ে দেব।"

"সে কী!" পুলিশ অফিসার বলল, "আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক সময় আগাতে পারি না, একটা বৃত্তের মাঝে আটকা পড়ে যাই। তখন আপনাদের মতো ব্রিলিয়ান্ট এনলিটিক্যাল ডেটিকেটেড, থরো আর কমপ্রিহেনসিভ ইনভেস্টিগেশন যারা করে তাদের সাহায্যে যদি না পাই–"

ছোটাচ্চু তার নিজের সম্পর্কে বলা এই পাঁচটা ইংরেজি বিশেষণ মনে রাখার চেষ্টা করল, ব্রিলিয়ান্ট, এনলিটিক্যাল, ডেডিকেটেড, থরো এবং কমপ্রিহেনসিভ। কী অসাধারণ!

পুলিশ অফিসার বলল, "আপনি প্লিজ না করতে পারবেন না। আমাদেরকে হেল্প করেন–"

ছোটাচ্চু একটা ভাব নিয়ে বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আগে বলেন শুনি। দেখি হেল্প করতে পারি কি না।"

পুলিশ অফিসার এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। এটা এখন শুধু আপনার আর আমার মাঝে থাকবে। আর কেউ যেন জানতে না পারে।"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "জানবে না।"

অবশ্যি ছোটাচ্চু জানত না বসার ঘরে জানালার নিচে বাসার প্রায় সব বাচ্চা মাথা নিচু করে ছোটাচ্চুর সাথে পুলিশ অফিসারের কথাবার্তা শুনছিল। এই অতি গোপনীয় আলাপটা বাচ্চারা সবাই খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনল।

পুলিশ অফিসার ছোটাচ্চুকে যেটা জানাল সেটা সংক্ষেপে এ রকম : দেশে জাল নোটের একটা সমস্যা সবসময়েই ছিল কিন্তু সবসময়েই সেই জাল নোট হতো পাঁচশ' কিংবা হাজার টাকার। কিন্তু এখন খুবই বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটেছে। দশ টাকার জাল নোটে বাজার ভরে গেছে। পাঁচশ' টাকা কিংবা হাজার টাকার জাল নোট একজনকে গছিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন, ভালো করে যাচাই-বাছাই না করে এই বড় নোট কেউ নেয় না। দশ টাকার জাল নোটের বেলায় সেটা সত্যি নয়, মানুষ চোখ বন্ধ করে দশ টাকার নোট নিয়ে নেয়, সেটা পরে জাল নোট বের হলেও সেটা নিয়ে কেউ বেশি বিচলিত হয় না। বরং অনেক সময় এই জাল নোট নিয়ে হাসি-তামাশা করে। তাই যারা দশ টাকার জাল নোট বের করে তারা মোটেও যত্ন নিয়ে জাল নোট তৈরি করে না, একেবারে ফটোকপি করার মতো করে জাল নোট তৈরি করে–খুবই সস্তায়। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই দলটাকে ধরতে পারছে না। তাই তারা ছোটাচ্চুর কাছে এসেছে কীভাবে ধরা যায় সেটার একটা বুদ্ধি নেওয়ার জন্যে।

সবকিছু শুনে ছোটাচ্চু বলল যে সে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখবে, তারপর জানাবে। পুলিশ অফিসার খুব খুশি হয়ে ছোটাচ্চুকে কিছু কাগজপত্র দিয়ে চা-নাশতা খেয়ে চলে গেল।

ছোটাচ্চু পুলিশ অফিসারের সাথে কথা শেষ করে যখন বাসার ভিতরে এলো তখন তার মুখ বেশ হাসি হাসি। বাচ্চারা ততক্ষণে দাদির কাছে চলে এসে টেলিভিশন দেখার ভান করছে। ছোটাচ্চুকে দেখে টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চু, পুলিশ অফিসার তোমাকে কী বলেছে?"

"একটা কেস নিয়ে এসেছে।"

"তুমি না ডিটেকটিভ কাজ ছেড়ে দিয়েছ?"

"ছেড়েই তো দিয়েছিলাম কিন্তু এমনভাবে ধরেছে, না করতে পারলাম না!"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী কেস ছোটাচ্চু?"

"সেটা বলা যাবে না। খুবই গোপনীয়।"

"বলো না আমাদেরকে, প্লিজ।"

"উঁহু।" ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, "বলা যাবে না।"

সবাই মুখ টিপে হাসল, ছোটাচ্চু সেটা লক্ষ করল না। কিছুক্ষণ টেলিভিশন দেখে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল, মনে হলো পুলিশ অফিসার যে ফাইলটা দিয়ে গেছে সেটা দেখছে। অনেক দিন পর ছোটাচ্চুর ভেতরে একধরনের উৎসাহ ফিরে এসেছে।

পরদিন বিকালে সব বাচ্চারা একসাথে বসেছে, টুনি সবাইকে ডেকে এনেছে। যখন সবাই গোল হয়ে বসেছে তখন টুনি বলল, "ছোটাচ্চু এখন বাসায় নাই, তাই আমি তোমাদের সবাইকে ডেকেছি।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"ছোটাচ্চুকে যখন তার কোম্পানি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে তখন ছোটাচ্চুর খুব মন খারাপ হয়েছে।"

প্রমি বলল, "মন খারাপ হতেই পারে। নিজের কোম্পানি থেকে কখনো কেউ বরখাস্ত হয়?"

শাহানা বলল, "স্টিভ জবস হয়েছিল।"

প্রমি বলল, "কিন্তু ছোটাচ্চু তো স্টিভ জবস না।"

শান্ত বলল, "ছোটাচ্চু হচ্ছে বোকাসোকা মানুষ। সহজ-সরল মানুষ।"

টুনি বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমার ভিতরে অনেক প্যাঁচ, সে জন্যে তোমার কাছে সবাইকে মনে হয় বোকাসোকা, সহজ-সরল।"

শান্ত বলল, "শব্দটা প্যাঁচ না, শব্দটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। ইন্টেলিজেন্স।"

প্রমি বলল, "খামোখা বাড়তি কথা বলে লাভ নাই। কী জন্যে ডেকেছিস সেইটা বল।"

টুনি বলল, "আমরা সবাই কালকে লুকিয়ে লুকিয়ে পুলিশ অফিসার আর ছোটাচ্চুর কথা শুনেছি।"

মুনিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, "কাজটা ঠিক হয় নাই। কারো গোপন কথা শুনতে হয় না।"

শান্ত বলল, "বড় বড় কথা বলবি না, দিব একটা থাবড়া।"

মুনিয়া তখন চুপ করে গেল।

টুনি বলল, "পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলেছে এটা অনেক বড় ব্যাপার। ছোটাচ্চুর খুব মন খারাপ, যদি এই কেসটা সলভ করতে পারে তাহলে ছোটাচ্চুর মনটাও ভালো হয়ে যাবে, ছোটাচ্চু আবার আগের মতো বাসায় বসে বসে কাজ করতে পারবে। একটা ইনকামও হবে।"

শাহানা বলল, "সেইটা তো বুঝলাম, কিন্তু আজকে সবাইকে তুই কেন ডেকেছিস?"

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু নিজে নিজে এই কেস সলভ করতে পারবে না। আমাদের ছোটাচ্চুকে সাহায্য করতে হবে।"

"আমাদের? আমরা কীভাবে সাহায্য করব?"

টুনি তখন তার হাতে ধরে রাখা ফাইলটা খুলে বলল, "পুলিশ অফিসার যে ফাইলটা দিয়ে গেছে সেটা নিয়ে এসেছি। পুলিশ যা যা জানে সেটা এখানে লেখা আছে।"

"কী লেখা আছে, দেখি?" বলে সবাই এগিয়ে এলো।

টুনি ফাইলটা দেখাল; বলল, "জাল নোটের নম্বর দেয়া আছে। ছয়টা আলাদা নম্বর। সবসময় ঘুরে-ফিরে এই ছয়টা নম্বরই আসে।"

শাহানা বলল, "ছয়টা?"

টুনি বলল, "হ্যাঁ। আর কয়েকটা জাল নোটও দিয়েছে দেখার জন্যে।"

"দেখি দেখি", বলে সবাই নোটগুলো দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়ে। শাহানা একটা নোট হাতে নিয়ে অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, হাতে ধরে আলোর বিপরীতে রেখে পরীক্ষা করল, তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "রঙিন লেজার প্রিন্টারে প্রিন্ট করেছে। সাইজটা ভালো করে কাটে নাই পর্যন্ত।"

টুনি বলল, "একটা এ ফোর কাগজে ছয়টার বেশি দশ টাকার নোট প্রিন্ট করা যায় না। সেই জন্যে খালি ছয়টা নম্বর।"

শান্ত বলল, "এত সোজা? তাহলে আমরা জাল নোটের বিজনেস শুরু করি না কেন?"

টুনি বলল, "সেই জন্যে তোমাকে ডেকেছি শান্ত ভাইয়া।"

"সেই জন্যে আমাকে ডেকেছিস মানে?"

"যারা জাল নোট তৈরি করে তারা ব্যবসাটা কীভাবে করে সেটা তোমার কাছ থেকে বোঝার জন্যে।"

শান্ত চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই কী বলতে চাইছিস?"

টুনি শান্ত গলায় বলল, "ধরা যাক, তোমার একটা রঙিন লেজার প্রিন্টার আছে, তুমি দশ টাকার জাল নোট তৈরি করো। তৈরি করার পর ধরা না পড়ে বাজারে ছাড়বে কেমন করে?"

শান্ত একটু রেগে বলল, "সেইটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

টুম্পা বলল, "শান্ত ভাইয়া, আমাদের মাঝে তুমি সবচেয়ে বেশি দুই নম্বুরি, সেই জন্যে টুনি আপু তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে। তাই না টুনি আপু?"

টুনি মাথা নাড়ল, তখন শান্ত বলল, "দেব একটা থাবড়া।"

শাহানা বলল, "এত রাগ হচ্ছিস কেন? একটু চিন্তা করে বল আমাদের! তোকে তো কেউ ক্রিমিনাল বলছে না, বলছে তুই ক্রিমিনালদের মতো চিন্তা করতে পারিস!"

প্রমি বলল, "হ্যাঁ, ক্রিমিনালদের মতো চিন্তা করলে কেউ ক্রিমিনাল হয় না।"

টুনি বলল, "এটাকে ক্রাইম ফ্যান্টাসিও বলতে পারো।"

শান্ত তখন একটু শান্ত হলো। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "বড় জাল নোট একটা গছাতে পারলেই অনেক লাভ। দশ টাকার জাল নোটে সেই রকম লাভ নাই। তাই অনেকগুলো জাল নোট একসাথে ব্যবহার করতে হবে। সেই জন্যে মার্কেটিং করার জন্যে অনেক মানুষ দরকার। কিন্তু মানুষ বেশি হলে ধরা পড়ার চান্স বেশি। তাই মার্কেটিং করতে হবে খুব কায়দা করে।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী রকম?"

"টোকাই বাচ্চাদের ব্যবহার করা সহজ, তারা জানবেও না–আমি তাদের জাল নোট দিয়ে বলব সেগুলো দিয়ে কিছু একটা কিনে আনতে! চকোলেট, ক্লিপ, পেন্সিল, কলম, ফিতা, সেফটিপিন! তারপর সেই জিনিসগুলো সস্তায় পাইকারি বিক্রি করব।"

শাহানা বলল, "ওয়ান্ডারফুল, তুই বড় হলে ঘাঘু ক্রিমিনাল হতে পারবি!"

টুম্পাকে জানালার কাছে দাঁড়া করিয়ে রাখা হয়েছিল, সে এ রকম সময়ে ছুটে এসে বলল, "ছোটাচ্চু আসছে! ছোটাচ্চু আসছে!"

সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল, টুনি ফাইলটা নিয়ে ছুটে গেল ছোটাচ্চুর ঘরে সেখানে রেখে আসার জন্যে। আজকের মিটিং মোটামুটি এখানেই শেষ।

ছোটাচ্চু যখন বাসায় থাকে না তখন বাচ্চারা মিলে আরো কয়েকবার মিটিং করল এবং সবাই মিলে চিন্তা-ভাবনা করে মোটামুটি কীভাবে তদন্ত করা যায় সেটা ঠিকও করে ফেলল। কিন্তু সেটা কীভাবে ছোটাচ্চুকে বলবে তারা বুঝতে পারছিল না, তখন ভেবে-চিন্তে তারা শেষ পর্যন্ত একটা পথ বের করল।

সেদিন রাত্রিবেলা যখন ছোটাচ্চু এসেছে তখন বাচ্চারা ছোটাচ্চুকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথমে মুনিয়া বলল, "চল, আমরা চোর-পুলিশ খেলি।"

টুম্পা বলল, "নাহ্, এটা খুবই পানসে খেলা। এটা খেলব না।"

"তাহলে কী খেলবে?"

শান্ত বলল, "আয়, ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল খেলি।"

"সেটা কীভাবে খেলে?"

"আমরা একজন একজন করে ক্রিমিনাল হয়ে ক্রাইম করব, অন্যেরা হবে ডিটেকটিভ, তারা ক্রিমিনালকে ধরবে।"

মুনিয়া বলল, "ঠিক আছে। প্রথমে কে ক্রিমিনাল হবে?"

শান্ত বলল, "আমি।"

টুম্পা বলল, "তুমি কী করবে?

"মার্ডার!"

"ঠিক আছে মার্ডার করো।"

শান্ত বলল, "একজনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছাদে নিয়ে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেব। তার হাড্ডিগুড্ডি গুঁড়া হয়ে যাবে, মাথার ঘিলু বের হয়ে যাবে, পুরা শরীর থেঁতলে যাবে–"

তখন দাদি ধমক দিয়ে বললেন, "কী বলছিস এইসব?"

"খেলছি দাদি।"

"এইটা একটা খেলা হলো? বন্ধ কর এই খেলা।"

টুম্পা বলল, "ঠিক আছে। মার্ডার করার দরকার নাই। অন্য ক্রাইম করো।"

শান্ত বলল, "আসলে আমি মার্ডার করার এক্সপার্ট। অন্য ক্রাইম পানসে লাগে!"

"পানসে লাগলে লাগুক। অন্য ক্রাইম করো।"

শান্ত খানিকক্ষণ চিন্তা করার ভান করল, তারপর বলল, "ঠিক আছে, তাহলে নোট জাল করব।"

সবাই চোখের কোন দিয়ে দেখল শান্তর কথা শুনে ছোটাচ্চু কেমন জানি সোজা হয়ে বসল।

শান্ত বলল, "আমি নোট জাল করতে শুরু করেছি। সবাই পাঁচশ' আর এক হাজার টাকার নোট জাল করে, আমি শুরু করেছি দশ টাকার জাল নোট!"

এবারে ছোটাচ্চুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল, বিস্ফারিত চোখে শান্তর দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনি বলল, "দশ টাকার নোট জাল করে তোমার পোষাবে না।"

"একশ'বার পোষাবে।" শান্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, "আমি মার্কেটিং করব টোকাইদের দিয়ে। তাদেরকে দশ টাকার জাল নোট দিয়ে বলব কিছু একটা কিনে আনতে।"

টুম্পা বলল, "কিন্তু তুমি জাল নোট বানাবে কেমন করে?"

"খুবই সোজা। রঙিন লেজার প্রিন্টারে জাল নোট ছাপাব। একটা এ ফোর কাগজে ছয়টা এঁটে যাবে।"

"তার মানে শুধু ছয়টা নম্বরের জাল নোট হবে?"

"হ্যাঁ। সমস্যা কী? কেউ কখনো নোটে কী নম্বর আছে দেখে না।"

ছোটাচ্চু তখন মুখ হাঁ করে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, শান্ত বলল, "তোরা কেউ আমাকে ধরতে পারলি না। আমি হচ্ছি ক্রিমিনালদের সেরা। এক নম্বর ক্রিমিনাল!"

টুনি বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমাকে ধরা খুবই সোজা।"

"কীভাবে ধরবি?"

"লেজার প্রিন্টারে খুবই সুন্দর রঙিন ছাপা হয় সত্যি–কিন্তু সেই প্রিন্টারের কার্টিজের দাম অনেক বেশি। সব জায়গাতে পাওয়া যায় না।"

"তাতে সমস্যা কী?"

"সমস্যা হচ্ছে, ঢাকা শহরে মাত্র অল্প কিছু দোকানে রঙিন লেজার প্রিন্টারের টোনার পাওয়া যায়। আমি সেই দোকানগুলোতে খোঁজ নিব, দেখব কে মাঝে মাঝেই এত দামি টোনার কিনছে। তাহলেই তুমি ধরা পড়ে যাবে–"

সবাই দেখল ছোটাচ্চু হঠাৎ কেমন জানি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল, তারপর ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

বাচ্চারাও তখন ছোটাচ্চুর পিছু পিছু গেল। ছোটাচ্চু নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই ফোনে একজনের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। বাচ্চারা দরজায় কান লাগিয়ে শুনল ছোটাচ্চু বলছে, "কমিশনার সাহেব, জাল নোটওয়ালাদের ধরার খুব সহজ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। রঙিন লেজার প্রিন্টারের টোনার যারা বিক্রি করে তাদের দোকানে যদি চোখ রাখা যায়..."

বাচ্চারা মুখে হাত দিয়ে খিঁকখিঁক করে হাসতে হাসতে সরে এলো।

দুই দিন পর রাত্রিবেলা দাদির ঘরে সবাই বসে আছে তখন ছোটাচ্চু এসে ঢুকল। হাতে বিশাল একটা কেক। বাচ্চারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "কেক! কেক!"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কেক কেন এনেছ ছোটাচ্চু!"

ছোটাচ্চু বলল, "মনে আছে পুলিশ কমিশনার কয়দিন আগে একটা কেস নিয়ে এসেছিল?"

"হ্যাঁ ছোটাচ্চু, মনে আছে।"

"সেই কেসটা সলভ করেছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। বিশাল একটা গ্রুপকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।"

সবাই তখন আনন্দের মতো শব্দ করল। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কেসটা কী ছিল ছোটাচ্চু? আমাদের বলবে?"

"না।" ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, "বলা যাবে না। এটা খুবই গোপনীয়।"

BOILOVERS.COM
PRESENT

সিডনি শেলডনের সব গুলো বই পাবেন

http://www.boilovers.com/index.php?forums/67/

বুবাই কাহিনি

এই বাসায় সন্ধেবেলা নিয়ম করে সবাইকে পড়তে বসতে হয়। পড়ুক আর নাই পড়ুক সবাইকে পড়ার টেবিলে বসে থাকতে হয়। আজকেও সবাই বসেছে– এই মুহূর্তে শুধু শান্তকে দেখা যাচ্ছে না। এটি অবশ্যি নূতন কিছু নয়, পড়ার টেবিলে শান্তকে মাঝে মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

যারা পড়তে বসেছে তাদেরও যে পড়াশোনায় খুব মনোযোগ আছে, সেটা বলা যাবে না। টুনি অনেক কষ্ট করে একটা অংক শেষ করেছে, আরেকটা শুরু করবে কি না চিন্তা করছিল, তখন শান্ত এসে হাজির হলো। সে গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মতো করে বলল, "দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত! দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত!"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কেন শান্ত ভাইয়া? দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত কেন?"

"দাদি সেজেগুজে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।"

দাদি সেজেগুজে নিচে নেমে আসা এই বাসার বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যে আসলেই একধরনের বিপদ সংকেত। দাদি (কিংবা নানি) তাঁর সব আত্মীয়-স্বজন, এমনকি আত্মীয়-স্বজনের আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরও খোঁজখবর রাখেন। মাঝে মাঝেই দাদি সেই সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে যান। দাদি কখনোই একা যান না, তাঁর অনেক নাতি-নাতনির কোনো একজনকে ধরে নিয়ে যান। নাতি-নাতনিরা সাধারণত এই আত্মীয়-স্বজনদের চিনে না, তাই কেউই দাদির সাথে যেতে চায় না। নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে খসে পড়ার চেষ্টা করে।

শান্তর বিপদ সংকেতে কোনো ভুল নেই। সত্যি সত্যি দাদি (কিংবা নানি) তাদের পড়ার ঘরে এসে হাজির হলেন। সত্যি সত্যি দাদি সেজেগুজে এসেছেন। দাদির বয়স যখন কম ছিল, তখন নিশ্চয়ই খুবই সুন্দরী ছিলেন, এখনো দেখলে বোঝা যায়। টুম্পা বলল, "দাদি তোমাকে খুবই সুইট লাগছে, শুধু ঠোঁটে একটু লিপস্টিক দিলে–"

দাদি বললেন, "তারপরে বলবি চোখে কাজল, মুখে পাউডার, চুলে কলপ–"

টুনি বলল, "না, দাদি আমরা কিছু বলব না। তুমি যে রকম আছ সে রকমই ভালো।"

দাদি বললেন, "আমি মারিয়ার বাসায় যাব। তোরা কে যাবি আমার সাথে আয়।"

তখন সবাই যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল, কেউ আস্তে কেউ জোরে। প্রমি বলল, "দাদি, তোমার সাথে যাওয়া হচ্ছে যন্ত্রণা। তোমার মারিয়া না ফারিয়ারা বসে শুধু ঘ্যানঘ্যান করে, হাজবেন্ডকে নিয়ে একশ' রকম নালিশ করে আর আমাদের বসে বসে সব শুনতে হয়!"

টুম্পা বলল, "জোর করে হালুয়া খাওয়ায়। কী পচা হালুয়া!"

শান্ত বলল, "লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করে। কত বড় সাহস! আমি লেখাপড়া করি আর না করি তাতে তাদের এত সমস্যা কী?"

দাদি বললেন, "আমি এত কিছু শুনতে চাই না। কে যাবি আমার সাথে।"

শান্ত বলল, "ঠিক আছে, লটারি করি। লটারিতে যার নাম উঠবে সে যাবে।"

তখন টুনি উঠে দাঁড়াল, "থাক শান্ত ভাইয়া, তোমার লটারি করতে হবে না। তোমার লটারি আমার জানা আছে, নিজের নাম না লিখে অন্য সবার নাম লিখে রাখবে।" তারপর দাদির দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো দাদি। আমি যাব তোমার সাথে।"

অন্য সবাই তখন আনন্দের মতো শব্দ করল।

টুনি তার ফ্রকটা পাল্টে নিয়ে একটা বই নিয়ে নিল। এখানে বসে বসে অংক করার থেকে মারিয়াদের বাসায় বসে গল্পের বই পড়া খারাপ কিছু না।

দাদি অনেক দরদাম করে একটা স্কুটার ঠিক করলেন। দরদাম করার মাঝে দাদি অনেক বড় এক্সপার্ট, কোনো কিছুই দরদাম না করে নেন না। স্কুটারে উঠে টুনি জিজ্ঞেস করল, "দাদি মারিয়াটা কে?"

"ওমা! মারিয়াকে চিনিস না? আমার যে খালাতো বোন আছে জোবেদা, তার ছোট মেয়ে।"

"তোমার আপন খালাতে বোন?"

"আপনের মতোই। মায়ের বান্ধবী।"

টুনি চুপ করে গেল, দাদির সব আত্মীয়-স্বজন এ রকম। লতায়-পাতায়। তবে মজার ব্যাপার হলো, দাদি যখন কোনো খোঁজখবর না দিয়ে এ রকম হুট করে হাজির হয়, সবাই কিন্তু খুব খুশি হয়। এর কারণটা কী কে জানে।

স্কুটার থেকে নেমে দাদি একটা বাসার সামনে দাঁড়ালেন; খানিকক্ষণ বাসাটার আশেপাশে তাকালেন, তারপর বললেন, "এই বাসাটাই হবে।"

"তুমি সিওর না?"

"মোটামুটি সিওর। অনেক দিন পরে এসেছি তো, তাই প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে।"

বাসার দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এটি ঠিক বাসা নয়, পাশের বাসাটি ঠিক বাসা। কাজেই তারা পাশের বাসায় গেল। পাশের বাসায় আবার কঠিন নিরাপত্তা, কার কাছে যাবে জিজ্ঞেস করে ফোন করে পারমিশান নিয়ে তারপর উপরে ওঠার অনুমতি পাওয়া গেল।

লিফটে তিনতলায় উঠে দেখা গেল দরজা খুলে মারিয়া দাদির জন্যে অপেক্ষা করছে। দাদি লিফট থেকে বের হবার সাথে সাথে মারিয়া দাদিকে জড়িয়ে ধরল, তারপর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। সাথে যে টুনিও আছে সেটা মনে হয় দেখতেই পেল না।

ভিতরে ঢুকেই টুনি বুঝতে পারল এরা অনেক বড়লোক। দাদির আত্মীয়-স্বজন বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত টাইপ। কেউ বেশি মধ্যবিত্ত কেউ কম মধ্যবিত্ত। এরা মোটেও মধ্যবিত্ত না, এরা যথেষ্ট বড়লোক। বড়লোকের বাসায় সবকিছু সাজানো-গোছানো থাকে, তাই সেখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। টাইলস দেয়া মেঝে থাকে, তাই জুতো খুলে ঢুকতে হয়, ঘরের চারপাশে নানা রকম শোকেস থাকে, সেখানে নানা রকম বিদেশি পুতুল থাকে। ঘরের দেওয়ালে দেখে কিছু বোঝা যায় না–এ রকম তেলরঙের ছবি থাকে। সোফার সামনে কফি টেবিলে বিদেশি ইংরেজি ম্যাগাজিন থাকে। মধ্যবিত্তের বসার ঘরেই টেলিভিশন থাকে, বড়লোকের টেলিভিশন থাকে ভিতরে। কাজেই বসার ঘরে কোনো টেলিভিশন নাই, টুনিকে পুরো সময়টা বসে বসে টেলিভিশন দেখতে হবে না। দাদির সাথে আলাপ-আলোচনা আরেকটু জমে ওঠার পর সে তার গল্পের বইটা খুলতে পারবে। এখনই গল্পের বইটা খুলে পড়া শুরু করা মনে হয় একটু বেয়াদপি হয়ে যাবে। টুনি ধৈর্য ধরে গল্পগুজব জমে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

দাদির খালাতো বোনের মেয়ে মারিয়া দাদির সাথে নানা ধরনের গল্প-গুজব করছে। কথা বলার স্টাইলটা বড়লোকের কথা বলার স্টাইল, মেপে মেপে সুন্দর করে কথা বলা। টুনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে। বড়লোকেরা তাদের টাকা-পয়সার গল্প করতে ভালোবাসে কিন্তু সেই গল্পটি করে খুব কায়দা করে। যেমন–মারিয়া বলল, "বুঝলে খালা, তোমার জামাইয়ের কোনো বাস্তব বুদ্ধি নাই। সংসারে আমরা মাত্র তিনজন, কোথায় ছোট একটা গাড়ি কিনবে, ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাসের মতো ঢাউস একটা গাড়ি কিনে ফেলল।"

দাদি বললেন, "বড় গাড়িই তো ভালো, সবাই হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতে পারবে।"

"সেইটা অবশ্যি তুমি ঠিকই বলেছ খালা। গত মাসে শ্রীমঙ্গলের একটা রিসোর্টে গেলাম, জার্নিটা টেরই পেলাম না। বুবাই পর্যন্ত কোনো কমপ্লেইন করল না–"

"তোমার ছেলের নাম বুঝি বুবাই?"

"হ্যাঁ খালা। ভালো নাম আদনাফ আবেদীন। এমনিতে বুবাই ডাকি।"

দাদি বললেন, "যখন জন্ম হয়েছিল তখন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। এখন নিশ্চয়ই বড় হয়েছে।"

"হ্যাঁ খালা, বড় হয়েছে। সামনের মাসে এক বছর হবে।"

"তোমরা দুজনই কাজ করো, বাচ্চাকে দেখে কে?"

আলাপের এই পর্যায়ে মারিয়া গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "খালা, আমাদের কপাল খুব ভালো, বাচ্চা দেখার জন্যে খুব ভালো একটা বুয়া পেয়েছি। আমার কোনো চিন্তাই করতে হয় না। সে সব দেখে-শুনে রাখে।"

দাদি একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, "বাচ্চাকে সবসময় বুয়ার হাতে ছেড়ে দিও না। ছোট বাচ্চাদের কিন্তু মায়ের আদর খুব দরকার।"

মারিয়া বলল, "না, না, সবসময় বুয়ার হাতে ছাড়ি না। অফিস থেকে আসার পর তো আমার কাছেই থাকে।"

"দেখি তোমার বাচ্চাটাকে।"

মারিয়া তখন গলা উঁচিয়ে ডাকল, "মর্জিনা! মর্জিনা! বুবাইকে নিয়ে এসো।"

কিছুক্ষণের মাঝেই মর্জিনা বুবাই নামের বাচ্চাটাকে নিয়ে এলো। বাচ্চাটা ছটফটে। মারিয়া বুবাইয়ের দিকে হাত বাড়াল কিন্তু বুবাই তার মায়ের কাছে আসতে চাইল না, মর্জিনাকে আঁকড়ে ধরে রাখল। বোঝাই যাচ্ছে মায়ের চাইতে এখন মর্জিনাই বুবাইয়ের বেশি আপন।

মারিয়া একটু লজ্জা পেল, তাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় টেনে মর্জিনার কাছ থেকে বুবাইকে নিজের কোলে নিয়ে এলো।

দাদি বললেন, "দেও দেখি তোমার বাচ্চা আমার কাছে আসে কি না।"

দাদি হাত বাড়ালেন, বুবাই তখন দাদির কাছে চলে এলো।

টুনির ছোট বাচ্চা দেখতে খুব ভালো লাগে, সে উঠে এসে বুবাইয়ের সাথে একটা খেলা জমানোর চেষ্টা করল। খেলাটা খুব জমল না। বুবাই বড় মানুষের মতো টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর তার কাছে কিছু চাইছে সেভাবে হাত পাতল।

ছোট বাচ্চা, বয়স এখনো এক বছর হয়নি। ভালো করে মনে হয় বসতেই শিখেনি কিন্তু হাত পেতে কিছু চাওয়া শিখে গেছে। কী আশ্চর্য!

টুনি বাচ্চাটির নাক স্পর্শ করল, গাল টিপে আদর করল, তারপর কোলে নেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু বুবাই যেতে রাজি হলো না। সে দাদির দিকে তাকাল তারপর দাদির দিকে হাত পাতল।

দাদি হেসে বললেন, "দাদু, আমার কাছে তুমি কী চাইছ? তোমাকে দেওয়ার মতো কিছু তো নাই!"

মনে হলো বাচ্চাটা দাদির কথা বুঝে গেল। সে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে মুখ দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে হাত পেতে চাইতেই থাকল।

দাদি বাচ্চাটার ভাবভঙ্গি দেখে হি হি করে হেসে ফেললেন। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মারিয়া তোমার ছেলে এত বড় হয়ে গেছে, তাকে তো আমি কিছু দিলাম না।"

মারিয়া প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "না না, কিছু দিতে হবে না। শুধু মন থেকে দোয়া করে দেন। তাহলেই হবে।"

দাদি বললেন, "দোয়া তো সবসময়েই করি।"

তারপর এক হাতে বুবাইকে ধরে রেখে অন্য হাতে ব্যাগটা খুলে একটা পাঁচশ' টাকার নোট বের করে বললেন, "মা, তোমরা বড়লোক মানুষ, তোমাদের বাচ্চাকে ভালো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নাই। এই যে এই টাকাটা দিয়ে আমার দাদুকে একটু চকোলেট কিনে দিও!"

দাদি নোটটা বের করার সাথে সাথে বুবাই খপ করে নোটটা ধরে ফেলল। তারপর সেটা টেনে নিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল। দাদি থতমত খেয়ে বললেন, "মারিয়া, তোমার ছেলের খুব বুদ্ধি! সে বুঝে ফেলেছে এটা দিয়ে তার জন্যে চকোলেট কিনে দেবে। সে জন্যে আগেই নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।"

মারিয়া ভুরু কুঁচকে তার ছেলের দিকে তাকাল, তারপর হাত পেতে বলল, "বুবাই, ছিঃ! এটা দিয়ে দাও।"

বুবাই নোটটা মারিয়ার হাতে দিতে রাজি হলো না। শক্ত করে নিজের বুকের কাছে ধরে রেখে মর্জিনার দিকে তাকিয়ে আঁ আঁ করে ডাকতে লাগল।

মর্জিনা একটু অপ্রস্তুত হয়ে কাছে এগিয়ে আসতেই বুবাই নোটটা মর্জিনার দিকে এগিয়ে দেয়। মর্জিনা নোটটা হাতে নিতেই বুবাই তার মাড়ি বের করে মর্জিনার দিকে তাকিয়ে হাসল, যেন সে অনেক বড় একটা কাজ করেছে।

মর্জিনা নোটটা নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া হাত বাড়িয়ে নোটটা নিতে চাইল কিন্তু বুবাই আঁ আঁ করে চিৎকার করে আপত্তি জানাল, তাই নোটটা মর্জিনার হাতেই থাকল।

মারিয়া মুখ শক্ত করে মর্জিনাকে ভেতরে গিয়ে একটু চা-নাশতা নিয়ে আসতে বলল। বুবাই মর্জিনার সাথে ভেতরে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু মারিয়া যেতে দিল না, নিজের কোলে রেখে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকল।

মারিয়া একটু বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, "বাচ্চাটা মর্জিনাকে খুব পছন্দ করে। আগে একেবারে খেতে চাইত না, মর্জিনা আসার পর খাওয়া নিয়ে কোনো ঝামেলা করে না।"

দাদি বললেন, "ও।"

মারিয়া বলল, "জন্মের সময় গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল, এখন দেখি আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে।"

দাদি বললেন, "পুরুষ মানুষ গায়ের রং দিয়ে কী করবে?"

টুনি আপত্তি করে বলতে চাইছিল মেয়েরাই বা গায়ের রং দিয়ে কী করবে? কিন্তু নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে টুনি কিছু বলল না, চুপ করে রইল।

দাদি বললেন, "একটা বাচ্চা সুস্থ থাকাটাই বড় কথা।"

মারিয়া বলল, "মাশাআল্লাহ্, বাচ্চা আমার সুস্থই আছে। এর বয়সী অন্য বাচ্চারা কেমন জানি লুতুপুতু হয়, আমার বুবাই শক্ত-সমর্থ।"

দাদি বললেন, "বাহ্।"

বুবাই থেকে আলোচনা অন্যান্য বাচ্চাদের দিকে ঘুরে গেল। সেখান থেকে বাচ্চাদের বড় করার সমস্যা। সেখান থেকে লেখাপড়া। সেখান থেকে শিক্ষাব্যবস্থা। সেখান থেকে রাজনীতি–একবার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হবার পর আর থামাথামি নেই।

ততক্ষণে মারিয়ার স্বামীও চলে এসেছে। কমবয়সী বড়লোকদের যে রকম চেহারা হবার কথা ঠিক সে রকম চেহারা, থুতনিতে তিনকোনা একধরনের স্টাইলের দাড়ি। আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ইমপোর্ট, ডলার, ইউরো এগুলো।

একসময়ে মর্জিনা নাশতা নিয়ে এলো। মোটেও অখাদ্য হালুয়া নয়, চিকন চিকন স্যান্ডউইচ, পনিরের স্লাইস এবং সন্দেশ। সাথে দার্জিলিং চা।

দাদি যখন বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্যে উঠলেন তখন মারিয়া আর তার তিনকোনা স্টাইলের দাড়িওয়ালা স্বামী শুধু নিচে নামিয়ে দিল না, তাদের ঢাউস গাড়িতে তুলে ড্রাইভারকে পৌঁছে দিতে বলল। ড্রাইভার বিরস মুখে

টুনি আর দাদিকে বাসায় পৌঁছে দিল। গাড়ি থেকে নেমে দাদি তার ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে ড্রাইভারকে চা খাওয়ার জন্যে দিলেন। "না না লাগবে না আন্টি, লাগবে না", বলতে বলতে ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

বাসার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে দাদি বললেন, "বুঝলি টুনি, মারিয়ার বাচ্চাটা নিয়ে কিছু একটা গোলমাল আছে। গোলমালটা কী ধরতে পারছি না।"

টুনি বলল, "বড়লোকের বাচ্চাদের মনে হয় এ রকম গোলমাল থাকে।"

দাদি বললেন, "উঁহু। বড়লোকের বাচ্চার গোলমাল না। বড়লোকের বাচ্চারা এ রকম হয় না। মারিয়া বলেছে বাচ্চাটা কালো হয়ে যাচ্ছে, আসলে কালো হচ্ছে না।"

"তাহলে কী হচ্ছে?"

"রোদে পুড়ে রং এ রকম হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা বাসায় থাকে, বাচ্চার গায়ের রং রোদে পুড়বে কেন?"

দাদির কথাটা শুনে টুনির ডিটেকটিভ মন পুরোদমে কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেল না।

দু'দিন পর বাচ্চারা সবাই মিলে স্কুলে যাচ্ছে। সবাই মোটামুটি একসাথে রওনা দেয়, তারপর যেতে যেতে একেকজন একেক রাস্তায় ভাগ হয়ে যায়। টুনির স্কুলটা সবচেয়ে দূরে, এতটুকু দূরত্ব কেউ হেঁটে যায় না। কিন্তু টুনির হেঁটে যেতে খুব ভালো লাগে, তাই সে সুযোগ পেলেই হেঁটে হেঁটে যায়। রাস্তায় তখন কত রকম মানুষকে দেখতে পায়। একেকজন মানুষ একেক রকম, একেকজন একেকভাবে কথা বলে, হাঁটে, ঝগড়া করে! টুনি মনে হয় শুধু মানুষগুলোকে দেখে দেখেই একটা জীবন পার করে দিতে পারবে।

টুনির স্কুলে যাবার রাস্তাটা যখন বড় রাস্তায় পড়েছে সেখানে গাড়ির ভিড় লেগেই থাকে। যেখানে গাড়ির ভিড় সেখানেই ফেরিওয়ালার ভিড় আর ভিখিরির ভিড়। ভিখিরিদের দেখতে টুনির খুবই মজা লাগে, যখন তারা কারো কাছে হাত পেতে কিছু চায় তখন তাদের চেহারা হয় খুবই কাঁচুমাচু কিন্তু যখন নিজেরা নিজেরা থাকে তখন তারা খুবই হাসি-খুশি। ভিক্ষা করার ব্যবসাটা মনে হয় খুবই লাভের ব্যবসা।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভিখিরিদের লক্ষ করছিল; তখন সে একজন কম বয়সী মহিলাকে

দেখতে পেল। ময়লা একটা শাড়ি পরে একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটা গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাটি ছোট কিন্তু কী মায়াকাড়া চেহারা! মা যে রকম হাত পেতে ভিক্ষা করছে ছোট বাচ্চাটিও সে রকমভাবে হাত পাতছে! মা'কে দেখে এই গেন্দা বাচ্চাটাও ভিক্ষা করা শিখে গেছে।

টুনি হঠাৎ ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। মারিয়ার বাচ্চা বুবাই ঠিক এভাবে হাত পেতেছিল! টুনি ভালো করে তাকাল, না এটি মারিয়ার বাচ্চা বুবাই না, অন্য কোনো বাচ্চা। টুনি দেখল একজন গাড়ির কাচ নামিয়ে একটি ময়লা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল, বাচ্চাটা খপ করে নোটটা হাতে নিয়ে নেয়, তারপর হাতটা তার মায়ের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মা নোটটি নিয়ে বাচ্চাটিকে আদর করে এবং বাচ্চাটি মাড়ি বের করে রাজ্য জয় করার ভঙ্গি করে হাসল। ঠিক বুবাইয়ের মতন।

এই মা'টি যে রকম তার বাচ্চাকে নিয়ে ভিক্ষে করছে মারিয়ার বাসার মর্জিনা কি একইভাবে বুবাইকে নিয়ে ভিক্ষে করে? সে জন্যেই কি বুবাইয়ের গায়ের রং রোদে পুড়ে কালো হয়েছে?

টুনি ভালো করে আবার মহিলাটি আর বাচ্চাটির দিকে তাকাল। সত্যিই কি এই বাচ্চাটি এই মহিলার? নাকি এই বাচ্চাটিও বুবাইয়ের মতো একটি বাচ্চা?

টুনি বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, স্কুলে দেরি হয়ে যাবে। সে রাস্তা পার হয়ে পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। কিন্তু মাথা থেকে চিন্তাটাকে সরাতে পারে না।

সন্ধেবেলা টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে গেল। ছোটাচ্চু বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছে। টুনিকে দেখে ছোটাচ্চু বই পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করল, "কী খবর টুনি?"

টুনি বলল, "কোনো খবর নাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "খবর না থাকলেই ভালো। খবর মানেই যন্ত্রণা।"

"খবর নাই কিন্তু প্রশ্ন আছে।"

ছোটাচ্চু বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাল, বলল, "সাত।"

"সাত?"

"হ্যাঁ।"

"সাত কী?"

"তোর প্রশ্নের উত্তর।"

টুনি বলল, "তুমি আমার প্রশ্নটাই শুনোনি, একটা উত্তর দিয়ে দিলে!"

"প্রশ্ন না শুনেই উত্তর দিতে হয়। প্রশ্ন শুনলে হয়তো দেখব উত্তরটা জানি না।"

টুনি বলল, "আমি তোমাকে যে প্রশ্নটা করব তুমি তার উত্তর জানো।"

"ঠিক আছে, কর প্রশ্ন।"

"তুমি কি একটা ডিটেকটিভ কাজ করবে?"

ছোটাচ্চু বইটা পেটের উপর রেখে বলল, "ডিটেকটিভ কাজ?"

"হ্যাঁ।"

"উঁহু। আমার এজেন্সি নাই, আমি কী কাজ করব? তোদের বলেছি না, আমি ডিটেকটিভ কাজ ছেড়ে দিব।"

"তুমি তাহলে কী করবে?"

"এখনো ঠিক করি নাই। বই লিখতে পারি।"

"কী বই?"

ছোটাচ্চু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ডিটেকটিভ বই।"

টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি শেষ একটা ডিটেকটিভ কাজ করে দেবে?"

"তুইও তো ডিটেকটিভ। তুই করিস না কেন?"

"আমি পারলে করতাম, কিন্তু আমি পারব না।"

"কেন পারবি না?"

"আমি ছোট সেই জন্যে। কেউ করতে দেবে না।"

ছোটাচ্চু চুপ করে রইল। টুনি বলল, "তুমি এই কাজটা করে দাও, যদি দেখা যায় আমি যেটা সন্দেহ করছি সেটা সত্যি, তাহলে অনেক বড় কাজ হবে।"

ছোটাচ্চু তবুও মুখ সুচালো করে বসে রইল। টুনি বলল, "প্লিজ ছোটাচ্চু। প্লিজ।"

ছোটাচ্চু শেষ পর্যন্ত বলল, "ঠিক আছে, বল। শুনি কী কাজ।"

টুনি তখন ছোটাচ্চুকে মারিয়ার ছেলে বুবাইয়ের কথা বলল, তার সন্দেহ হচ্ছে মারিয়ার বাসার কাজের মহিলা মর্জিনা বাচ্চাটাকে নিয়ে ভিক্ষে করতে বের হয়। মারিয়াদের বাসার সামনে অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে মর্জিনা আসলেই বাচ্চাটাকে নিয়ে বের হচ্ছে কি না। যদি বের হয় তাহলে পিছু পিছু গেলেই দেখা যাবে বাচ্চাটাকে নিয়ে কোথায় যায়, কী করে। খুবই

সহজ-সরল কেস। কিন্তু টুনির স্কুলে যেতে হয় তাই সে এটার সমাধান করতে পারবে না। অন্যদের করতে হবে।

ছোটাচ্চু খানিকক্ষণ চিন্তা করল; তারপর বলল, "আমি তোর কেসটা নিতে পারি কিন্তু তুইও থাকিস আমার সাথে।"

টুনির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "আমাকে নেবে সাথে?"

"হ্যাঁ। তোর কেস তুই না থাকলে কেমন হবে? আমি তোর আম্মুকে বলে স্কুলে না যাওয়ার পারমিশান নিয়ে রাখব। এক দিন স্কুলে না গেলে কিছু হবে না।"

পরদিন খুব সকালে ছোটাচ্চু টুনিকে নিয়ে বাসা থেকে বের হলো। সাথে একটা ক্যামেরা, তার লেন্স যথেষ্ট লম্বা। টুনি যে স্কুলে না গিয়ে ছোটাচ্চুর সাথে যাচ্ছে, অন্য বাচ্চারা সেটা টের পায়নি, টের পেলে একটা হুলস্থূল লাগিয়ে দিত।

টুনি বের হয়ে দেখল বাসার সামনে একটা স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে। ছোটাচ্চুকে দেখে স্কুটারের ড্রাইভার স্কুটার থেকে নেমে একটা লম্বা সালাম দিল; বলল, 'ভালো আছেন স্যার?"

"হ্যাঁ ভালো আছি জসীম। তোমার খবর কী?"

"আমার খবর আর কোথা থেকে হবে, আপনি আমাকে আর ডাকেন না, জীবন খুবই পানসে!"

ছোটাচ্চু হাসার চেষ্টা করল; বলল, "কাজ ছেড়ে দিয়েছি, তোমাকে আর ডেকে কী করব!"

জসীম নামের স্কুটার ড্রাইভার তার স্কুটারের দরজা খুলে দিতে দিতে বলল, "আপনি কাজ ছাড়েন নাই স্যার, ওই বদমাইশের বাচ্চা আপনার কোম্পানি দখল করে নিয়েছে।"

ছোটাচ্চু স্কুটারে উঠতে উঠতে বলল, "নিয়েছে তো নিয়েছে, সমস্যা কী?"

"আপনি পারমিশান দিলেন না, স্কুটার দিয়ে ধাক্কা দিয়ে শালার দুইটা ঠ্যাং ভেঙে দিতাম, ছয় মাস হাসপাতালে থাকলে একেবারে সিধা হয়ে যেত।"

ছোটাচ্চু কোনো কথা বলল না। স্কুটারের ভেতর টুনি ছোটাচ্চুর পাশে বসার পর জসীম দরজা বন্ধ করে দিল। খাঁচার মতো এই স্কুটারগুলো খুবই অদ্ভুত, স্কুটারওয়ালা যখন বন্ধ করে দেয় তখন প্যাসেঞ্জার আর নিজে থেকে

দরজা খুলতে পারে না! কোনো প্যাসেঞ্জার কোনোদিন সেটা নিয়ে আপত্তি করে না, কারণটা কী?

জসীম তার স্কুটার চালিয়ে রওনা দিল; কোথায় যেতে হবে কিছুই বলতে হলো না; টুনি অনুমান করল, আগে থেকেই বলে দেয়া আছে।

সত্যি সত্যি জসীম তার স্কুটার চালিয়ে মারিয়ার বাসার এলাকায় চলে এলো। বাসা থেকে খানিকটা দূরে রাস্তার পাশে জসীম তার স্কুটার থামাল, বলল, "এসে গেছি স্যার।"

ছোটাচ্চু টুনিকে জিজ্ঞেস করল, "কোন বাসাটা মনে আছে?"

"হ্যাঁ।" টুনি মাথা নাড়ল। "কালো গেট।"

কাজেই কালো গেট থেকে কে কে বের হয় সেটা দেখার জন্যে তিনজনই অপেক্ষা করতে থাকে।

অফিস টাইমের কাছাকাছি সময়, তাই আশেপাশের প্রায় সব বাসা থেকেই লোকজন কাজে যাবার জন্যে বের হতে শুরু করেছে। টুনি দেখল একসময় একটা অফিসের দামি মাইক্রোবাস এসে থামল এবং মারিয়ার স্বামী কোট-টাই পরে বের হয়ে সেই মাইক্রোবাসে উঠে অফিস গেল। তার কিছুক্ষণ পর বাসা থেকে একটা বড় গাড়ি বের হয়ে এলো, সেই গাড়িতে মারিয়া বসে আছে, সে অফিস যাচ্ছে।

এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। একটা স্কুটারের ভেতর এক ঘণ্টা বসে থাকা সোজা কথা নয়, তাই মাঝে মাঝে টুনি আর ছোটাচ্চু স্কুটার থেকে বের হয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল। টুনি ভেবেছিল অপেক্ষা করতে করতে ছোটাচ্চু বুঝি বিরক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু ছোটাচ্চু মোটেও বিরক্ত হলো না। টুনি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ছোটাচ্চু, তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো?"

"না। একটা কাজে এসেছি, বিরক্ত হব কেন?"

"যদি দেখা যায় আমার সন্দেহটা মিথ্যা তাহলে তুমি আমার উপর রাগ হবে না তো?"

"রাগ হব কেন? খুশি হব। বাচ্চাটা সেফ আছে, ক্রিমিনালদের হাতে নেই জানলে রাগ হব কেন?"

টুনি একটু হাসল; বলল, "আগে তোমার মোটেই ধৈর্য ছিল না! ডিটেকটিভ হওয়ার পর অনেক ধৈর্য বেড়েছে।"

ছোটাচ্চু একটু হাসল; বলল, "সেটা তুই ভুল বলিসনি! আমার ডিটেকটিভ কাজের নব্বই ভাগ হচ্ছে কারো বাড়ির সামনে, না হলে কারো অফিসের সামনে বসে অপেক্ষা করা।"

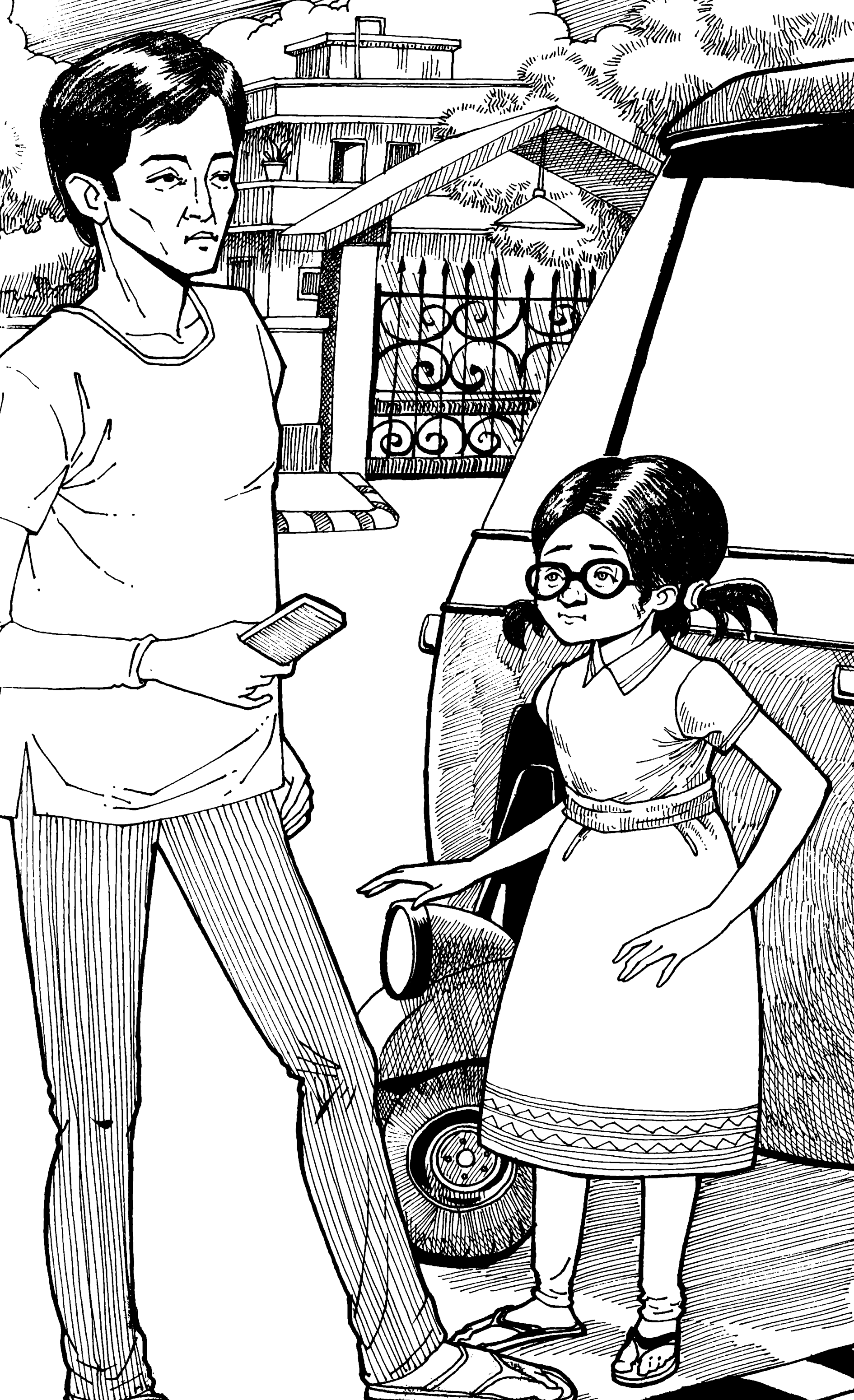

দুজন যখন কথা বলছিল তখন সত্যি সত্যি মর্জিনা বুবাইকে কোলে নিয়ে বের হয়ে এলো। বাসার কাজের মহিলা একটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক নয়, বাসার দারোয়ানের তাকে থামানোর কথা। কিন্তু বাসার দারোয়ান তাকে থামাল না, বরং দেখা গেল দারোয়ান আর মর্জিনা দুজন একটু কথা বলল। শুধু তা-ই নয়, মর্জিনা তার কোমরে গুঁজে রাখা একটা নোট বের করে দারোয়ানের হাতে দিল। বোঝাই যাচ্ছে দুজনের মাঝে একধরনের বোঝাবুঝি আছে।

ছোটাচ্চু নিচু গলায় বলল, "টুনি, তোকে কংগ্র্যাচুলেশন। তুই সত্যি সত্যি একটা বিরাট বড় কেস সলভ করেছিস।"

টুনি উত্তেজিত হয়ে বলল, "আগে পুরোটা দেখে নিই।"

ছোটাচ্চু জসীমকে বলল, "জসীম, এই মহিলাকে ফলো করতে হবে।"

জসীম বলল, "কোনো সমস্যা নাই।"

মর্জিনা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। ছোটাচ্চু আর টুনি তখন স্কুটারে উঠে বসল। ছোটাচ্চু স্কুটারের ভেতর থেকে বুবাই আর মর্জিনার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিল।

মর্জিনা আরেকটু সামনে গিয়ে একটা রিকশায় উঠল। রিকশাটা রাস্তা ধরে এগোতে থাকে; জসীম একটু দূর থেকে রিকশাটার পিছু পিছু তার স্কুটার নিয়ে যেতে থাকে। জসীম অনেক দিন থেকে ছোটাচ্চুর সাথে কাজ করে আসছে, তাই কখন কী করতে হবে খুব ভালো জানে।

বড় রাস্তায় এসে মর্জিনা রিকশাটাকে ছেড়ে দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রথম দুটি বাস ছেড়ে দিয়ে মর্জিনা তিন নম্বর বাসটাতে উঠে পড়ল। জসীম তখন বাসটার পিছু পিছু যেতে থাকে, কাজটা সহজ নয় কিন্তু টুনি দেখল জসীম খুব ভালোভাবে বাসটার পিছু পিছু যাচ্ছে।

শহরের ঠিক মাঝখানে এসে মর্জিনা বুবাইকে কোলে নিয়ে নেমে পড়ল। ছোটাচ্চু আর টুনি স্কুটারের ভেতর বসে থেকে মর্জিনা কী করে সেটা লক্ষ করে। তারা দেখল মর্জিনা মোড়ের একটা টংয়ের ভেতর বসে থাকা একটা মানুষের সাথে কথা বলল, মানুষটা তখন আঙুল দিয়ে ব্যস্ত রাস্তার পাশে ফুটপাথে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। মর্জিনা সেখানে একটা ময়লা কাপড় বিছিয়ে বুবাইকে বসিয়ে দিল; টুনি অবাক হয়ে দেখল বুবাই সাথে সাথে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করতে থাকল। দেখে মনে হলো ভিক্ষা করার ব্যাপারটা বুবাইয়ের বেশ পছন্দ, তার কাছে সেটা একটা খেলার মতো।

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু বলল, "বল।"

"এখন মর্জিনাকে ধরা উচিত না?"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে মনে হয় বড় গ্যাং কাজ করছে। আমরা কিছু করতে চাইলে পুরো গ্যাং মনে হয় নেমে যাবে।"

"তাহলে?"

"আগে কাছে থেকে কয়েকটা ছবি তুলি।"

"ছবি তুললে সন্দেহ করবে না?"

"না। আমার লেন্সে একটা আয়না লাগানো আছে। একদিকের ছবি তোলার ভান করে অন্যদিকের ছবি তোলা যায়।"

ছোটাচ্চু তখন তার ক্যামেরা নিয়ে নেমে গেল। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার বাস, গাড়ি, স্কুটার, টেম্পোর ছবি তোলার ভান করে সে বুবাই আর তার কাছাকাছি বসে থাকা মর্জিনার অনেকগুলো ছবি তুলে নেয়। টুনি যেহেতু মারিয়ার বাসায় গিয়েছে এবং মর্জিনা তাকে দেখেছে তাই সে কাছাকাছি গেল না। দূরে স্কুটারের ভেতর বসে রইল।

বুবাই বেশ তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার করতে থাকে। সামনে দিয়ে গেলেই সে হাত পাতে এবং সবাই বুবাইকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে এবং অনেকেই তাকে টাকা-পয়সা দেয়। বুবাই তখন মানুষটাকে তার মাড়ি বের করে একটা হাসি উপহার দেয়। নোটটা সে দুই হাত শক্ত করে ধরে রাখে এবং মর্জিনা কাছে এলে মর্জিনার হাতে তুলে দেয়।

বুবাই ফুটপাথে বসে বসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফুটপাথ থেকে ময়লা তুলে মাঝে মাঝে মুখে দেয়, স্বাদটা পছন্দ হলে খেয়ে ফেলে, পছন্দ না হলে থু করে ফেলে দেয়। টুনি একধরনের আতঙ্ক নিয়ে দেখল বুবাই একটা সিগারেটের গোড়া মুখে দিয়ে দিল, মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে স্বাদটা পছন্দ না হওয়ায় মুখটা বিকৃত করে থু থু করে ফেলে দিল। কাছেই মর্জিনা নিরাসক্ত-ভাবে বসে আছে, বুবাই কী মুখে দিচ্ছে, কী করছে, সে ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

ছোটাচ্চুর সন্দেহ সত্যি। এলাকাটা কিছু মানুষ কন্ট্রোল করে। মর্জিনার সাথে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা আছে। টুনি দেখল একসময় ডাকাতের মতো চেহারার একজন এসে মর্জিনার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে গেল।

দুপুরবেলা ছোটাচ্চু টুনিকে নিয়ে একটা ফাস্টফুডের দোকানে খেতে গেল। টুনি একটা হামবার্গার খেতে খেতে বলল, "আমার খুব খারাপ লাগছে ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু তার হামবার্গারে বড় একটা কামড় দিয়ে বলল, "কেন?"

"বুবাই রৌদ্রের মাঝে বসে ভিক্ষা করছে আর আমরা কিছুই করতে পারছি না।"

"করতে পারছি না কে বলেছে? ইচ্ছা করে কিছু করছি না। এখন কিছু করার চেষ্টা করলে সবগুলো পালিয়ে যাবে। সে জন্যে অপেক্ষা করছি।"

টুনি কোল্ড ড্রিংকসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "পাজি মেয়ে মানুষটা বুবাইকে কিছু খেতে দিবে কি না কে জানে! বুবাইয়ের খিদে পেয়েছে। ফুটপাথ থেকে তুলে তুলে ময়লা খাচ্ছে। আমি স্পষ্ট দেখলাম একটা সিগারেটের বাঁট মুখে দিল!"

ছোটাচ্চু বলল, "ওটা নিয়ে চিন্তা করিস না। বুবাই ফুটপাথে থেকে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে হয় সিগারেটের বাঁটও হজম করে ফেলবে। আর মর্জিনা নিশ্চয়ই বুবাইকে কিছু খাওয়াবে, তার বিজনেসের জন্যে খাওয়াতে হবে!"

টুনি বলল, "তা ঠিক।"

ফাস্টফুডের দোকান থেকে বের হয়ে দুজনেই দূর থেকে বুবাইকে লক্ষ করল। ভিক্ষা করে করে সে নিশ্চয়ই কাহিল হয়ে গেছে। এখন সে শক্ত ফুটপাথের উপর উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। প্রচণ্ড রোদ, মাছি ভনভন করছে কিন্তু তাতে বুবাইয়ের কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হলো না।

ছোটাচ্চু আর টুনি আশেপাশে থেকে মর্জিনাকে আর বুবাইকে চোখে চোখে রাখল। তিনটার দিকে মর্জিনা তার ব্যবসা গুটিয়ে নিল। বুবাইকে কোলে তুলে নিয়ে মোড়ের টংয়ের কাছে গিয়ে কয়েকজন মানুষের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল, মনে হলো কোনো একধরনের লেনদেন হলো। তারপর সে বাসায় রওনা দিল। প্রথমে বাস, তারপর রিকশা এবং শেষ অংশ পায়ে হেঁটে।

মর্জিনার বাসায় ঢোকার পর টুনি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "যাক বাবা, বাসায় ফিরে এসেছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "হ্যাঁ।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করব?"

"মারিয়া আর তার হাজব্যান্ড বাসায় ফিরুক, তখন গিয়ে আমরা কথা বলব। মর্জিনাকে আটকাতে হবে। তার কাছ থেকে খবর নিয়ে পুরো গ্যাংটাকে ধরতে হবে।"

"আমরা এখন কোথায় অপেক্ষা করব?"

"বাসা থেকে ঘুরে আসতে পারি। মারিয়া আর তার হাজব্যান্ড কখন বাসায় আসবে কে জানে! রাস্তাঘাটে যা ট্রাফিক জ্যাম, অফিস থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে নিশ্চয়ই দুই-তিন ঘণ্টা লেগে যায়।"

সন্ধেবেলা ছোটাচ্চু আর টুনি মারিয়ার বাসায় ফিরে এলো। স্কুটার থেকে নেমে ছোটাচ্চু জসীমকে বলল, "জসীম, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমরা কাজ সেরে আসি।"

জসীম বলল, "কোনো সমস্যা নাই। আমি আছি।"

টুনি ছোটাচ্চুকে মারিয়ার ফ্ল্যাটের সামনে নিয়ে এলো, বেল বাজাতেই মারিয়ার স্বামী দরজা খুলে দিল। ছোটাচ্চু বলল, "আমার নাম শাহরিয়ার, আমি একটা দরকারি কাজে এসেছিলাম। আমাকে আপনি চিনবেন না, আমার মা'কে চিনবেন। পরশু রাতে আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।"

গলার স্বর শুনে মারিয়াও বের হয়ে এলো; টুনিকে দেখে সে চিনতে পারল; মুখে হাসি ফুটিয়ে ছোটাচ্চুকে বলল, "আসেন। শুনেছিলাম আপনি অনেক বড় ডিটেকটিভ অফিস দিয়েছেন—"

ছোটাচ্চু কিছু বলল না, টুনিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। টুনি দেখল পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মর্জিনা ছোটাচ্চুকে দেখছে। দুপুরবেলা ছোটাচ্চু তার ক্যামেরা দিয়ে মর্জিনার পাশে দাঁড়িয়ে অনেক ছবি তুলেছে। মর্জিনা কি ছোটাচ্চুকে চিনে ফেলেছে?

টুনি দাঁড়িয়ে গেল, ছোটাচ্চুকে বলল, "ছোটাচ্চু তুমি কথা বলো, আমি এক্ষুনি আসছি।"

"কই যাচ্ছিস?"

"নিচে, জসীম ভাইয়ের কাছে। স্কুটারে একটা বই ফেলে এসেছি, নিয়ে আসি!"

ছোটাচ্চু একটু অবাক হলো, বের হওয়ার সময় টুনির হাতে বই ছিল সেটা মনে করতে পারল না। তবে এটাও সত্যি, টুনির কাজকর্ম বোঝা মুশকিল।

ছোটাচ্চু বসার ঘরে সোফায় বসে মারিয়া আর তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আপনাদের কয়েকটা ছবি দেখাই। আমি জানি এ রকম ছবি কারো বিশ্বাস হবার কথা নয় কিন্তু ছবিগুলো সত্যি।"

ছোটাচ্চুর গলার মাঝে কিছু একটা ছিল, যেটা শুনে মারিয়া আর তার স্বামী দুজনেই ভয় পেয়ে গেল। শুকনো মুখে বলল, "কীসের ছবি?"

"আপনাদের বাচ্চা বুবাই কোথায়?"

"ভেতরে। মর্জিনার কাছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবেন, প্লিজ?"

মারিয়া মর্জিনাকে ডেকে বলল, "মর্জিনা, বুবাইকে দিয়ে যাও আমার কাছে।"

মর্জিনা বুবাইকে নিয়ে বাইরের ঘরে এলো। মারিয়া হাত বাড়িয়ে বুবাইকে নেওয়ার চেষ্টা করল। বুবাই মর্জিনাকে শক্ত করে ধরে রাখল, মারিয়ার কাছে আসতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত একরকম জোর করে তাকে নিজের কোলে নিল। মর্জিনা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, ছোটাচ্চু মর্জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি একটু ভেতরে যাবেন, প্লিজ?"

মর্জিনা খুব অনিচ্ছার সাথে ভেতরে গেল। এ রকম সময়ে টুনি ফিরে এলো; ছোটাচ্চু বললেন, "টুনি দরজাটা বন্ধ করে দে।"

টুনি দরজা বন্ধ করে ছোটাচ্চুর পাশে এসে বসল। ছোটাচ্চু তার ক্যামেরার পিছনের স্ক্রিনে সকালে তোলা ছবিগুলো একটা একটা করে বের করে দেখাতে দেখাতে বলল, "এই যে দেখেন, আজকে সকালে আপনার বাসার গেটে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। আপনারা দুজন কাজে বের হয়ে যাচ্ছেন। তার এক ঘণ্টা পর মর্জিনা আপনাদের ছেলেকে কোলে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।"

মারিয়া চমকে উঠে বলল, "বুবাইকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?"

ছোটাচ্চু দেখালেন, "এই যে আপনাদের ছেলে। রাস্তার ফুটপাথে। ভিক্ষা করানোর জন্যে বসিয়ে দিয়েছে।"

মারিয়া আর তার স্বামী কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না, তারপর অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, "কী বলছেন আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি শুধু বলছি না। আপনাদের দেখাচ্ছি–"

মারিয়া হঠাৎ চিলের মতো চিৎকার করে ডাকল, "মর্জিনা মর্জিনা–"

মর্জিনা বেশ শান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। একটা হাত আঁচলে ঢাকা, হাতে মনে হয় কিছু আছে। টুনি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই হঠাৎ যে ঘটনাটা ঘটল সেটার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। মর্জিনা একটা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে মারিয়ার কাছ থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বুবাইকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে নিল।

সবাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন মর্জিনা হিংস্র গলায় বলল, "খবরদার কেউ কাছে আসবে না।" মর্জিনা এক হাতে বুবাইকে কোলে নিয়ে অন্য হাতটি আঁচলের নিচ থেকে বের করে আনল। সেই হাতে কোনো

মারাত্মক অস্ত্র নেই, খুবই সাধারণ একটা ললিপপ। বুবাই ললিপপ দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে চায়, কিন্তু মর্জিনা ললিপপটা বুবাইয়ের হাতে দিল না, তার মুখের সামনে একটু দূরে ধরে রাখল।

মারিয়া চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে?"

মর্জিনা শান্ত গলায় বলল, "এই কাঠি লজেন্সটা ইন্দুর মারার বিষের মাঝে চুবাইয়া আনছি। আপনেরা একটু তেড়িবেড়ি করেন তো বুবাইয়ের মুখের মাঝে ঢুকাইয়া দিমু।"

মারিয়া চিৎকার করে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। সবাই চুপ করে বসেন।"

সবাই আবার সোফায় বসল। মারিয়ার স্বামী কাঁপা গলায় বলল, "তুমি ভাবছ তুমি পার পেয়ে যাবে?"

"আগে অনেকবার পার পাইছি, কাজেই, মনে হয় এইবারও পার পাইমু। আর আমি যদি পার না পাই, তাহলে আপনাদের বাচ্চাও পার পাইব না। এই বাচ্চা আপনাদের চিনে না, আমারে চিনে।"

ছোটাচ্চু বলল, "কী চাও তুমি?"

মর্জিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টিতে বিষ ঢেলে বলল, "দুপুরবেলা যখন ক্যামেরা নিয়ে আপনি খালি আমার পাশে দাঁড়াইয়া বাস-ট্রাকের ছবি তুলবার লাগছিলেন, তখনই আমার সন্দেহ হইছিল, কার ছবি তুলেন, বাস-ট্রাকের, না আমার?"

ছোটাচ্চু কিছু বলল না, মর্জিনা টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছেমড়ি, পাকঘরে যাও। দেখো টেবিলের উপর একটা ব্যাগ আছে। ব্যাগটা নিয়া আসো। খবরদার কোনোরকম টেংরিবাজি করবা না।"

টুনি কোনো টেংরিবাজি করল না, রান্নাঘরে গিয়ে দেখল একটা ব্যাগ। টুনি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বের হয়ে এলো। উঁকি দিয়ে দেখল, ব্যাগের ভেতর সোনাদানা, অলংকার, টাকা-পয়সা। মর্জিনা এগুলো অনেক দিন থেকে জমা করেছে।

মর্জিনা বলল, "ব্যাগটা একেকজনের সামনে নিয়ে ধরো। আর আপনারা ব্যাগের মধ্যে আপনাদের মোবাইল টেলিফোনটা রাখেন।"

মারিয়ার স্বামী আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মর্জিনা তখন একটা ধমক দিল; বলল, "খবরদার কোনো কথা নাই। আমার হাতে সময় নাই।"

টুনি একেকজনের সামনে ব্যাগটা নিয়ে ধরল এবং সবাই তার মোবাইল ফোন ব্যাগের মাঝে রাখল। টুনি ব্যাগটা মর্জিনার হাতে দেয়। মর্জিনা খুশি হয়ে বলল, "চমৎকার! এখন আপনারা আর কাউকে ফোন করতে পারবেন না।"

মর্জিনার কোলে বুবাই আশেপাশে তাকাল, কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। ললিপপটা খাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে সেটা ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মর্জিনা বলল, "এইবারে আমি যাচ্ছি। বাচ্চাটারে নিচে দারোয়ানের কাছে দিয়া যামু। সাথে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। বাচ্চাটা খালি জন্ম দিছেন আর কিছু করেন নাই। মানুষ যা করার আমি করছি।"

মর্জিনা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, "বাসার চাবিটা দেন।"

মারিয়া শুকনো মুখে বলল, "বাসার চাবি?"

"হ্যাঁ। আমি জানি দুইজনের কাছে দুইটা চাবি থাকে। চাবি দুইটা, তাড়াতাড়ি।" মর্জিনা টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছেমড়ি। চাবি দুইটা আমার কাছে নিয়া আসো।"

মারিয়া আর তার স্বামী চাবি দুটো টুনির হাতে দিল। টুনি চাবি দুটো মর্জিনার হাতে দিল। মর্জিনা দুই হাত দিয়েই বুবাই, ব্যাগ, ললিপপ আর চাবি দুটো ম্যানেজ করে দরজা খুলে বাইরে যেতে যেতে বলল, "খবরদার, কুনো চেঁচামেচি নাই। আমি যদি একটু শব্দ শুনি তাহলেই কিন্তু খবর আছে।"

মর্জিনা দরজা বন্ধ করল। বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল। বাইরে থেকে বলল, "বেকুবের দল। কাঠি লজেন্সের মাঝে কিছু ছিল না! বুবাইকে খেতে দিলাম।" তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

মারিয়া এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তার স্বামী সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কেঁদো না মারিয়া। এই মহিলা অনেক ডেঞ্জারাস, অনেক কিছু হয়ে যেতে পারত। ভাগ্যিস বেশি কিছু হয় নাই।"

"বুবাই, আমার বুবাইকে নিয়ে যাবে না তো?"

"না, না, নিবে না। বলেছে নিচে দারোয়ানের কাছে রেখে যাবে।"

"যদি না রাখে?" মারিয়া আবার কেঁদে উঠল।

টুনি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে বলল, "আমার কি মনে হয় জানেন?"

সবাই টুনির দিকে ঘুরে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"মর্জিনা বেশি দূর যেতে পারবে না। সে এতক্ষণে নিচে আটকা পড়েছে।"

মারিয়া চোখ বড় বড় করে বলল, "কেন? এ কথা কেন বলছ?"

টুনি বলল, "এ রকম একটা কিছু হতে পারে আমার এ রকম সন্দেহ হয়েছিল। আমি তাই নিচে স্কুটারের ড্রাইভার জসীম ভাইকে বলে এসেছি।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী বলে এসেছিস?"

"বলে এসেছি যে, যদি সে দেখে যে মর্জিনা বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে সে যেন স্কুটার চালিয়ে কাছে যায়। মর্জিনা নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি একটা স্কুটারে উঠতে চেষ্টা করবে, তাকে যেন স্কুটারে নিয়ে নেয়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি। আর স্কুটারের ভেতর উঠলে দরজা আর নিজে খোলা যায় না। খাঁচার ভিতরে আটকা পড়ে যায়। জসীম ভাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে মর্জিনাকে আটকে ফেলেছে।"

মারিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার কাছে দরজার আরেকটা চাবি আছে। খুঁজে পাব কি না জানি না।"

মারিয়ার স্বামী বলল, "খুঁজে দেখো, না হলে দরজা ভেঙে বের হতে হবে।"

মারিয়া শোয়ার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের উপর খোঁজাখুঁজি করে একটা চাবির গোছা পেয়ে গেল। সেটা হাতে নিয়ে ছুটে এসে চাবিগুলো দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকে।

একটা চাবি দিয়ে সত্যিই দরজা খুলে গেল। চারজন সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করে। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে এসে সবাই থেমে গেল। সেখানে মেঝেতে বসে বুবাই চেটে চেটে ললিপপ খাচ্ছে। সবাইকে দেখে সে মাড়ি বের করে হেসে হাত পাতল।

মারিয়া ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে ললিপপটা কেড়ে নিল। তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

অন্যেরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। সত্যি সত্যি বাসার সামনে জসীমের স্কুটার এবং স্কুটারের ভেতরে বসে মর্জিনা দরজা ধরে টানাটানি করতে করতে চিৎকার করছে। জসীমের ভেতর কোনো উত্তেজনা নেই; সে নেমে মর্জিনাকে বলল, "চিল্লাফাল্লা কইরা লাভ আছে? আমার স্কুটারের দরজা খাঁটি স্টিলের, খুলতে পারবা না।"

ছোটাচ্চু বলল, "ওয়েল ডান জসীম।"

জসীম দাঁত বের করে হাসল, টুনিকে দেখিয়ে বলল, "বুদ্ধিটা তো আমার না–বুদ্ধি এই ছোট আপার।"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল; বলল, "হ্যাঁ, টুনির বুদ্ধি একটু বেশি। পরশু দিন এই বাসায় বেড়াতে এসেছিল, তখনই সন্দেহ করেছিল কিছু একটা ঘটেছে।"

জসীম বলল, "এখন কী করবেন স্যার?"

"পুলিশকে খবর দিতে হবে। কিন্তু আমার মোবাইলটা তো মর্জিনার কাছে।"

"দরজা খুলে ব্যাগটা বের করমু?"

ছোটাচ্চু বলল, "না, না। খাঁচার দরজা খোলা যাবে না। এই মহিলা খুব ডেঞ্জারাস। আগে পুলিশ আসুক।"

সবাই স্কুটার ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। স্কুটারের ভেতর আটকে থাকা মর্জিনা বিষদৃষ্টিতে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনি কিছুক্ষণ মর্জিনার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে সে সরে গেল।

কী কারণ কে জানে, সে নিজের ভেতর একধরনের বেদনা অনুভব করে।

BOILOVERS.COM

PRESENT

বিজ্ঞান চিন্তা

অক্টোবর ২০১৬ - বর্তমান পর্যন্ত

সব গুলো সংখ্যা পাবেন

http://www.boilovers.com/index.php?forums/63/

বিউটি পার্লার

দরজায় কলিংবেলের টুং-টাং শব্দ শুনে টুনি দরজা খুলে দেখে ফারিহাপু দাঁড়িয়ে আছে। টুনি শান্ত টাইপের মানুষ, আনন্দ বা রাগ কখনোই বাড়াবাড়ি করে প্রকাশ করতে পারে না। ফারিহাপুকে দেখে তার খুবই আনন্দ হলেও সেটা সেভাবে প্রকাশ পেল না, সে শুধু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "ফারিহাপু! তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"কতদিন পরে তোমাকে দেখছি।"

ফারিহাপু মাথা নাড়ল; বলল, "হ্যাঁ। অনেক দিন পর তোমাদের বাসায় এসেছি।"

ফারিহাপু ভিতরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে বলল, "কী করব বলো! কাউন্সেলিং করতে করতে সময় পাই না।"

টুনি একটু অবাক হয়ে বলল, "কাউন্সেলিং? তুমি কাকে কাউন্সেলিং করো ফারিহাপু?"

"আর কাকে! তোমার ছোটাচ্চুকে।"

"ছোটাচ্চুকে?" টুনি প্রথমে একটু অবাক হলো, তারপর ফিক করে একটুখানি হেসে ফেলল।

ফারিহাপু অবশ্যি মোটেও একটুখানি হাসল না, হাসতে হাসতে প্রায় গড়াগড়ি খেতে লাগল; বলল, "মানুষ জীবনেও এ রকম একটা ঘটনা শুনেছে? যার কোম্পানি তাকে সেখান থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে? ঘটনাটা শুনে হাসিতে আমার পেট ফেটে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তো আর তোমার ছোটাচ্চুর সামনে হাসতে পারি না। বেচারা তাহলে মনে কষ্ট পাবে।"

টুনি মাথা নাড়ল; বলল, "হ্যাঁ, ছোটাচ্চুর খুব মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু আমরা খুব খুশি হয়েছি। কোম্পানি দেওয়ার পর ছোটাচ্চু আস্তে আস্তে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল!"

ফারিহাপু ষড়যন্ত্রীদের মতো এদিক-সেদিক তাকিলে গলা নামিয়ে বলল, "আমিও খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে।"

"কী কারণে ফারিহাপু?"

"আমি ভাবতাম তোমার ছোটাচ্চু মানুষটা হচ্ছে একেবারে নরমসরম লুতুপুতু মানুষ। কিন্তু সে যে মারামারিও করতে পারে সেইটা আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম।" ফারিহাপু আবার হি হি করে হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে প্রায় তার চোখে পানি এসে গেল, কোনোমতে হাসি থামিয়ে বলল, "শুধু কি মারামারি? মারামারি করে একেবারে হাজতবাস। চোর, ডাকাত, পকেটমারদের সাথে সহাবস্থান"–কথা শেষ করে ফারিহাপু আবার হি হি করে হাসতে থাকে।

ফারিহাপু হাসি থামিয়ে বলল, "যাও দেখি, তোমার ছোটাচ্চুকে খবর দাও, বলো আমি এসেছি।"

টুনি ভেতরে গিয়ে দেখল ছোটাচ্চুর ঘর ফাঁকা, সেখানে কেউ নেই। ঝুমু খালা খবর দিল ঘণ্টা খানেক আগে ছোটাচ্চু নাকি সেজেগুজে বের হয়ে গেছে। টুনি ফিরে এসে ফারিহাপুকে জানাল যে ছোটাচ্চু নেই। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি যে আসছ সেটা ছোটাচ্চু জানে না?"

ফারিহাপু মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্! আমি তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম, সে জন্যে বলিনি। এই জীবনে যতবার কাউকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়েছি ততবার ধরা খেয়েছি।"

"কী নিয়ে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলে ফারিহাপু?"

"তোমাকে দেখাই।" বলে ফারিহাপু তার ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, "এই দেখো।"

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "ড্রাইভিং লাইসেন্স! তুমি গাড়ি চালাতে পারো?"

ফারিহাপু বুকে থাবা দিলে বলল, "অবশ্যই পারি! এমনি এমনি কি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েছে নাকি! আর তোমাকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি।"

"কী জিনিস?"

"যে ঢাকা শহরে গাড়ি চালাতে পারে সে পৃথিবীর যেকোনো জায়গাতে গাড়ি চালাতে পারে। কাজেই ধরে নাও এই ড্রাইভিং লাইসেন্সটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় গাড়ি চালানোর লাইসেন্স!"

ফারিহাপু ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ব্যাগের ভিতরে রাখতে রাখতে বলল, "সারপ্রাইজটা যেহেতু মাঠে মারা গিয়েছে, তাহলে একটু ফোন করে দেখি শাহরিয়ার সাহেব কোথায় আছেন।"

ফারিহাপু তার ফোন বের করে ছোটাচ্চুকে ফোন করল, ছোটাচ্চু নিশ্চয়ই ফারিহাপুর ফোন পেলে খুব উত্তেজিত হয়ে যায়, তাই জোরে জোরে কথা বলে। টুনি তাই ফোন না ধরেও ছোটাচ্চুর গলা শুনতে পেল, "আরে ফারিহা তুমি?"

"হ্যাঁ আমি।"

"তুমি কোত্থেকে?"

"তোমার বাসা থেকে। তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে এসেছিলাম, এসে নিজে সারপ্রাইজ খেলাম।"

"কী সারপ্রাইজ?"

"বলে দিলে কি সারপ্রাইজ থাকবে নাকি? তুমি কোথায়?"

"মুন্সীগঞ্জ।"

"মুন্সীগঞ্জ? মুন্সীগঞ্জে কী করো?

"আমার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে এসেছি। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করতে হচ্ছে।"

"কী রকম ক্রাইসিস?"

"বর শেরওয়ানি আর পাজামা পরে এসেছে। পাজামার ফিতা ছিঁড়ে গেছে।"

ফারিহাপু মাথা নাড়ল। বলল, "বিশাল ক্রাইসিস। ম্যানেজ করো। ঠিক আছে, তুমি ফিরে এসো তখন কথা হবে।"

ফোন শেষ করে ফারিহাপু টুনির দিকে তাকাল, বলল "আমার হাতে এখন কয়েক ঘণ্টা সময়। কী করি বলো তো?"

টুনি বলল, তুমি গাড়ি চালাতে পারো, গাড়ি চালিয়ে শাঁই শাঁই করে কোথাও চলে যাও। বইয়ের দোকান, ছবির এক্সিবিশন, চিড়িয়াখানা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, কত কী আছে।"

"তুমি যে জায়গাগুলোর নাম বলেছ সেখানে একা একা যেয়ে কোনো আনন্দ নাই। একা একা যেতে হয় বোরিং জায়গায়। যে রকম বাজার করতে, না হলে ইলেকট্রিক বিল দিতে, না হলে বিউটি পার্লারে–"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "বিউটি পার্লার? আমি তো ভেবেছিলাম বিয়ের সময় মেয়েরা বিউটি পার্লারে সাজে।"

"বিয়ের সময় তো সাজেই, এমনিতেও যায়। বড়লোক মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে একজন আরেকজনের সাথে শাড়ি-গয়নার গল্প করে, না হলে একজন আরেকজনের কুটনামি করে!"

"তুমি যাও?"

"মাঝে মাঝে যাই। যখন দেখি চুলগুলো ত্যানার মতো হয়ে গেছে, না হলে মুখের চামড়া কার্পেটের মতো খসখসে হয়ে গেছে, তখন যাই। বিউটি পার্লারে খুব স্মার্ট কয়টা মেয়ে আছে, তারা কীভাবে কীভাবে জানি ঠিক করে দেয়।"

ফারিহাপু তখন হাত দিয়ে নিজের চুলগুলো পরীক্ষা করল, মুখে হাত বুলাল, তারপর ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে নানা অঙ্গভঙ্গি করে নিজের মুখ পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্, আমার চেহারা আস্তে আস্তে ডাইনি বুড়ির মতো হয়ে যাচ্ছে।"

টুনি বলল, "কী বলছ ফারিহাপু! তোমার চেহারা খুবই সুইট!"

"ওইটাই তো সমস্যা। যাদের চেহারা ভালো তাদেরকে বলে সুন্দরী। আর যাদের চেহারা ফার্নিচারের মতো তাদেরকে ভদ্রতা করে বলে সুইট।"

টুনি হেসে ফেলল, বলল, "না, আমি মোটেও সে জন্যে বলিনি–"

ফারিহা টুনির কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছিলাম, চেহারা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি কী দেখেছি জানো?"

"কী?"

"যে মানুষটাকে আমার ভালো লাগে তার চেহারা যে রকমই হোক, তাকে দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ ভালো হলেই তার চেহারা ভালো।"

টুনি মাথা নাড়ল। ফারিহাপু কথটা ঠিকই বলেছে। ফারিহাপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কিন্তু যেহেতু আমি মানুষটা তত ভালো না, তাই বিউটি পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল করে আসি। অন্তত মুখের চামড়াটা জুতোর চামড়ার মতো থাকবে না।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "ফেসিয়াল কী?"

ফারিহাপু বলল, "ও, ফেসিয়াল কি তুমি জানো না?"

"নাহ্।"

"মুখে একধরনের মাস্ক পরে বিশ-ত্রিশ মিনিট বসে থাকতে হয়। মুখের চামড়া পরিষ্কার হয়।"

ফারিহাপু চলে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বলল, "তোমার এখন কোনো কাজ আছে?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না, নাই।"

"তাহলে চলো আমার সাথে। বিউটি পার্লারের ভিতরে কী হয় নিজের চোখে দেখে আসবে। তারপর কোনো একটা ফাস্টফুডের দোকানে কিছু খেয়ে নেব। তোমার আম্মুর কাছ থেকে পারমিশান নিয়ে আসো। যাও।"

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল লাল একটা গাড়িতে ফারিহাপুর পাশে বসে টুনি যাচ্ছে। ফারিহাপু নিজে সিট বেল্ট পরেছে, টুনিকেও পরিয়েছে। ফারিহাপুর

গাড়িতে সিট বেল্ট না পরে কেউ নাকি উঠতে পারবে না। এই সিট বেল্টটা কেমন জানি টুনির গলায় ফাঁসের মতো আটকে আছে, এ ছাড়া কোনো সমস্যা নাই।

টুনি আবিষ্কার করল ফারিহাপু খুব ভালো গাড়ি চালায়, ঢাকা শহরে ভিড়ের ভিতর দিয়ে এক রিকশার পাশ দিয়ে অন্য স্কুটারকে পিছনে ফেলে বাসকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি চালানো খুব সহজ কথা না। টুনি খুব বেশি গাড়িতে ওঠেনি কিন্তু যখনই কারো গাড়িতে উঠেছে মনে হয়েছে ড্রাইভার বুঝি কাউকে ধাক্কা লাগাবে, শেষ মুহূর্তে গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করে থামিয়েছে। ফারিহাপু সেটা করে না, কেমন যেন শান্তিমতো গাড়ি চালায়।

ফারিহাপু একটা শপিং মলের নিচে গাড়ি পার্ক করল, তারপর টুনিকে নিয়ে শপিং মলের উপরে উঠে গেল। ছয়তলায় একটা বিউটি পার্লার, দরজায় ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা "পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষেধ"। টুনি বেশ অবাক হলো, এ রকম জায়গা আছে সে জানত না। ফারিহাপুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ফারিহাপু, এই সাইনটা দেখে পুরুষ মানুষ রাগ করে না?"

"করে নিশ্চয়ই। করলে করুক।"

ফারিহাপু দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, ভিতরে এয়ারকন্ডিশন করা বেশ আরামের ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব। ফারিহাপু ঢুকতেই কম বয়সের ছোটখাটো একটা মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, "আপা! এতদিন পরে আসলেন? আমাদেরকে ভুলে গেছেন?"

ফারিহাপু বলল, "না না, ভুলব কেন? বাচ্চা কেমন আছে?"

"বাচ্চার কথা বলবেন না। যত দিন যাচ্ছে তত বান্দরের বাচ্চার মতো হয়ে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড শান্ত হয়ে বসে না।"

"গুড!" ফারিহাপু বলল, "ছোট বাচ্চা যদি শান্ত হয়ে ভ্যাবলার মতো বসে থাকে তাহলে কেমন করে হবে?"

মেয়েটি ফারিহাকে একটা কাউন্টারে নিয়ে গেল, সেখানে ফারিহাপু খানিকক্ষণ কথা বলল, তখন আরেকজন মেয়ে ফারিহাপুকে পাশের ঘরে নিয়ে এলো। সেখানে সারি সারি বিছানা, সেখানে নানা রকম মহিলা শুয়ে আছে। তাদের কারো কারো মুখে সাদা মাস্ক, শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়, মনে হয় ছোট, বড়, মাঝারি অনেকগুলো ভূত শুয়ে আছে। তাদের দেখে টুনির হঠাৎ কেমন জানি হাসি উঠে গেল।

ফারিহাপু ভেতরে কোথায় গিয়ে একটা অদ্ভুত গাউন পরে এলো, তখন টুনি বুঝতে পারল কেন বাইরে বড় বড় করে লেখা "পুরুষের প্রবেশ

নিষেধ"। ফারিহাপু বিছানায় মাথাটা একটু উঁচু করে শুয়ে পড়ল, তখন একজন মহিলা একটা বাটিতে করে আলু ভর্তার মতো কিছু একটা নিয়ে এসে তার মুখে লাগাতে শুরু করল। টুনি একটু অবাক হয়ে দেখল ফারিহাপু দেখতে দেখতে অন্য বিছানায় শুয়ে থাকা মহিলাদের মতো ভয়ংকর হয়ে গেল, দুটো চোখ আর নাকের গর্ত ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, মনে হয় একটা ভূত শুয়ে আছে।

টুনি কাছে দাঁড়িয়ে আগ্রহ নিয়ে সবকিছু লক্ষ করছিল। ফারিহাপু বলল, "টুনি, তুমি ইচ্ছে করলে সোফায় গিয়ে বসতে পারো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।"

টুনি বলল, "একটু দেখি কীভাবে ফেসিয়াল করা হয়।"

যে মেয়েটি ফারিহাপুর মুখে আলু ভর্তার মতো জিনিসগুলো লাগাচ্ছিল সে হেসে বলল, "কেন? তুমি কি বিউটি পার্লার দেবে?"

টুনি কিছু বলার আগেই ফারিহাপু বলল, "না না, টুনি বিউটি পার্লার দেবে না, সে বড় হয়ে ডিটেকটিভ হবে। এখনই সে কত কেস সলভ করছে আপনি জানেন? পত্রিকায় টুনির উপর আর্টিকেল পর্যন্ত বের হয়েছে।"

ফারিহাপুর কথা শুনে টুনি লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, "ইশ! ফারিহাপু তুমি কী যে বলো!"

ঠিক তখন ফারিহাপুর পাশের বিছানাটাতে মোটামুটি পাহাড়ের মতো বড় একজন মহিলা এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। মহিলাটির চেহারায় কিছু একটা গোলমাল আছে, গোলমালটা কী টুনি ঠিক করে ধরতে পারল না। ঠোঁটের কটকটে লিপস্টিক নাকি মাথার উপর উঁচু করে রাখা চুল, নাকি থামের মতো বড় বড় হাত-পা কোনটা সমস্যা টুনি বুঝতে পারল না।

মহিলার শরীরের ভারে বিছানাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল এবং মহিলা ফাটা বাঁশের মতো শব্দ করে হুংকার দিল, বলল, "কে আছিস?"

টুনির ভুরু কুঁচকে উঠল। মহিলাটা যে শুধু দেখতে বিদঘুটে তা নয়, তার ব্যবহারও বিদুঘটে। পার্লারে এসে কাউকে তুই করে বল্লা যায় না। সবাই এখানে কাজ করে, তাদের আপনি করে বলতে হবে। বয়সের বড় পার্থক্য থাকলে এবং অনেক দিন থেকে চিনলে মায়া করে তুমিও বলা যেতে পারে কিন্তু তুই কখনো বলা যায় না।

মহিলাটার ভাষার কারণেই মনে হয় কেউ এলো না। তখন সে আবার চিৎকার করল, "আমার কাছে কে আসবি? কেউ নাই নাকি?"

তখন একজন মেয়ে খুবই মুখ ভার করে এলো। জিজ্ঞেস করল, "কী করাবেন? ফেসিয়াল নাকি আমলা?"

"এত কষ্ট করে হেয়ার ড্রেসার দিয়ে চুল ড্রেসিং করেছি, এখন আমলা করব নাকি? মাথার মাঝে ঘিলু নাই?"

মেয়েটা অপমানটা সহ্য করে বলল, "শুধু ফেসিয়াল?"

"ফেসিয়াল আর ম্যানিকিউর।"

বলে মহিলাটি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস নিতে লাগল।

পার্লারের মেয়েটি বাটিতে ফেসিয়ালের আলু ভর্তার মতো জিনিসটা ঘুঁটতে ঘুঁটতে নিয়ে এসে মহিলাটির মুখের মাঝে লাগাতে থাকে এবং ঠিক কী কারণ কে জানে, হঠাৎ করে টুনির শরীরটা ঘিনঘিন করতে থাকে। দেখতে দেখতে মহিলাটির চেহারাটাও রাক্ষসের মতো হয়ে গেল। অন্যদের থেকে এই মহিলাটির চেহারা আরো বিকট দেখাতে থাকে তার মোটা মোটা ঠোঁটের জন্যে। লিপস্টিক দিয়ে লাল করে রাখায় সেগুলো কেমন জানি রক্ত খেয়ে মোটা হয়ে থাকা জোঁকের মতো দেখাতে থাকে।

মুখে মাস্ক লাগানোর পর অন্য আরেকটি মেয়ে এসে তার হাতের নখ কাটতে থাকে, মোটা মোটা গোবদা গোবদা আঙুলে ময়লা নখ, কাটতে গিয়ে মেয়েটির নিশ্চয়ই ঘেন্না লাগছে। চাকরি করার জন্যে একজনকে কত কী করতে হয়–আরেকজনের নখ পর্যন্ত কেটে দিতে হয়। কেন এই মহিলা নিজের নখ নিজে কাটতে পারে না?

নখ কাটতে গিয়ে হঠাৎ করে নিশ্চয়ই কোথাও একটু খোঁচা লেগেছে। মহিলাটি তখন বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, শুনে মনে হতে লাগল কেউ বুঝি তার পেটে চাকু মেরেছে! হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিল। সেই গালিগালাজের ভাষা এত অশালীন যে শুনে টুনির কান পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে।

তখন ফারিহাপু তার ভূতের মতো চেহারা নিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে মহিলা, আপনি পেয়েছেনটা কী? এটা কী ধরনের ভাষায় কথা বলছেন? ভদ্র ভাষায় কথা বলেন।"

ফারিহাপুর কথায় মনে হলো মহিলার মুখের ভেতর কেউ পেট্রোল বোমা মেরে দিয়েছে, পাহাড়ের মতো মহিলা তার বিশাল শরীর নিয়ে উঠে বসে ফারিহাপুর দিকে তাকিলে বলল, "কে? তুমি কে? আমাকে ভদ্র ভাষায় কথা বলা শেখানোর জন্যে তুমি কে?"

ফারিহাপু মহিলার থেকেও জোরে বলল, "আমি কেউ না। কিন্তু এইখানে সব ভদ্রমহিলা আর ভদ্র মেয়েরা আছে। আপনি একজন এমপ্লয়ির সাথে এই ভাষায় কথা বলতে পারবেন না।"

পাহাড়ের মতো মহিলা বলল, "আমার ইচ্ছা হলে বলব। একশ'বার বলব। ইচ্ছা হলে আরো খারাপ ভাষায় কথা বলব, তোমার কী? আমি কি এখানে মাগনা সার্ভিস নেই? আমি পয়সা দিয়ে সার্ভিস নেই।"

ফারিহাপু বলল, "পয়সা দিলেই সবকিছু হয়ে যায় না। মানুষকে সম্মান করে কথা বলতে হয়। আপনার সম্মানবোধ না থাকতে পারে-আমাদের আছে। আমাদের সামনে আপনি এই ভাষায় এমপ্লয়িদের সাথে কথা বলতে পারবেন না।"

"আমি বলব, তুমি কী করবে?" মহিলাটি এবারে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ফারিহাপুর বিছানার কাছে গেল, মনে হয় এখন মহিলাটি বুঝি ফারিহাপুকে একটা ঘুষি মেরে দেবে।

ঠিক তখন টুনি মহিলার কানে একটি অত্যন্ত বিচিত্র জিনিস দেখতে পেল এবং হঠাৎ করে তার চোখ অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেল। টুনি তখন এক লাফ দিয়ে ফারিহাপু এবং মহিলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "ফারিহাপু সাবধান! এ কিন্তু পুরুষ মানুষ।"

চিৎকার-চেঁচামেচিতে এমনিতেই পুরো পার্লারের সবাই এদিকে তাকিয়ে ছিল। টুনির কথা শুনে এবারে সবাই আতঙ্কের মতো একটা শব্দ করল।

ফারিহাপু অবাক হয়ে বলল, "পুরুষ মানুষ!"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। দেখছ না কানে চুল? শুধু পুরুষ মানুষের কানে চুল হয়, মেয়েদের হয় না।"

ফারিহাপু বলল, "কী বলছ তুমি!"

"সত্যি বলছি। মেয়েদের দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকে, ছেলেদের একটা এক্স আরেকটা ওয়াই। শুধু ওয়াই ক্রোমোজোম থাকলে কানে চুল হয়। এই দেখো, কানে চুল। তার মানে পুরুষ।"

পার্লারের যে মেয়েটি নখ কেটে দিচ্ছিল সে এবারে লাফ দিয়ে পিছনে সরে এসে বলল, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

সবাই ধরে নিয়েছিল পাহাড়ের মতো মহিলা প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলবে, কিন্তু মহিলা হঠাৎ করে চুপ করে গেল, তার মুখ দিয়ে শব্দ বের হলো না। পাশের বিছানা থেকে একজন মহিলা গাউন দিয়ে শরীরটা ভালো করে ঢেকে ঢুকে বলল, "আপনি পুরুষ?"

মহিলা আমতা আমতা করে কিছু একটা বলে হঠাৎ করে যেটা করল তার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। পার্লারের মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কয়েকটা লাফ দিয়ে ঘর থেকে বের হবার চেষ্টা করে দরজায় ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে নিচে পড়ল। কোনোমতে লাফ দিয়ে উঠে আবার ছুটে

পালানোর চেষ্টা করল, ঠিক তখন তেজি চেহারার একটি মেয়ে খপ করে তার চুল ধরে ফেলতেই তার মাথা থেকে পুরো চুলটা খুলে বের হয়ে টাক-মাথা বের হয়ে এলো। কী বীভৎস একটি চেহারা! মাথায় টাক, মুখে ফেসিয়াল এবং মোটা মোটা লাল ঠোঁট।

মানুষটা আবার ছুটে পালাতে গিয়ে তার গাউনে পা প্যাঁচিয়ে গেল এবং সে দড়াম করে একটা আলমারিতে ধাক্কা খেল। আলমারির কাচ ভাঙার শব্দের সাথে সাথে ঝনঝন করে কৌটা ক্রিম আর কাচের বোতল নিচে এসে পড়ল। মানুষটা কীভাবে জানি তার গাউনটা মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় হাঁচড়পাঁচড় করে সেটা খুলে ফেলল, নিচে একটা খাকি হাফ প্যান্ট। সেই অবস্থায় কোনোভাবে লাফ দিয়ে উঠে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সে ছুটতে থাকে। পার্লারের কয়েকটা তেজি মেয়ে "ধর ধর" বলে চিৎকার করতে করতে তার পিছনে ছুটতে থাকে।

খালি গায়ে টাক-মাথার রোমশ একজন মানুষ খাকি একটা হাফ প্যান্ট পরে শপিং মলের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, যার মুখে ফেসিয়াল মাস্ক এবং ঠোঁটে লিপস্টিক এবং যার পিছনে কয়েকটা মেয়ে তাকে ধরার জন্যে ছুটে যাচ্ছে—এর থেকে বিচিত্র দৃশ্য আর কী হতে পারে?

ফারিহাপু যখন টুনিকে নিয়ে পার্লার থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন পার্লারের যে কয়জন মহিলা এবং মেয়ে ছিল সবাই টুনির সাথে একটা করে সেলফি তুলল। শুধু তা-ই না, দুজনকে তার অটোগ্রাফ দিতে হলো।

কাউন্টারে ফারিহাপুকে বিল দিতে হলো না, ম্যানেজার মহিলাটি বলল, "আপনার বিলটি আমরা দিয়ে দিচ্ছি।"

তারপর টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে ছোট ডিটেকটিভ, তোমার যেদিন বিয়ে হবে সেদিন আমাদের কাছে এসো, আমরা তোমাকে সাজিয়ে দেব। সব খরচ আমাদের।"

টুনি ঠোঁট উল্টে বলল, "আমি কখনো বিয়ে করবই না!"

BOILOVERS.COM
PRESENT

জিরো টু ইনফিনিটি

সংখ্যা পাবেন

http://www.boilovers.com/index.php?forums/68/

ঝুমু খালার গ্রামের বাড়ি

সন্ধেবেলা যখন ঝুমু খালা শিঙ্গাড়া ভেজে এনেছে তখন বড় চাচা ঝুমু খালাকে বলল, "ঝুমু, তোমার একটা চিঠি এসেছে।"

ঝুমু খালা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "বাড়িতে ঠিকানাটা দেওয়াই ঠিক হয় নাই। দুই দিন পরে পরে খালি চিঠি।"

টুম্পা বলল, "কেন ঝুমু খালা, তোমার চিঠি পেতে ভালো লাগে না?"

"সেইটা নির্ভর করে চিঠির ভিতরে কী আছে তার উপরে। বাড়ি থেকে যে চিঠি আসে সেইখানে থাকে খালি নাই নাই খবর। এইটা নাই, সেইটা নাই, এইটা লাগবে, সেইটা লাগবে–এই রকম কথাবার্তা। এই চিঠি পেলে কি ভালো লাগে? উল্টা মেজাজ গরম হয়।"

মুনিয়া বলল, "চিঠিটা খুলে দেখো–ভালো খবরও তো থাকতে পারে।"

"বাসার কাজকর্ম শেষ করি তারপর খুলব।"

ঝুমু খালা বুঝতে পারে নাই বাসার কাজকর্ম শেষ করে চিঠি খোলাটা অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে, তার সাথে সাথে চিঠিটা খোলা উচিত ছিল। চিঠিটা লিখেছে ঝুমু খালার ছোট বোন ঝর্ণা। ঝর্ণা গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে, সে দুই লাইনের একটা চিঠি লিখেছে :

> বুবু,
> বড় চাচা রবিবার চব্বিশ তারিখ আমার বিয়ে ঠিক করেছে। আমি বিয়ে করব না। যদি জোর করে আমাকে বিয়ে দেয় আমি গলায় দড়ি দিব, খোদার কসম।
> ঝর্ণা

চিঠি পড়ে ঝুমু খালা মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। তার এই ছোট বোনটাকে সে অনেক আদর করে। অল্প বয়সে বাবা মরে যাওয়ার কারণে তার নিজের লেখাপড়া হয় নাই। সেই জন্যে ঝুমু খালা তার ছোট বোনটাকে লেখাপড়া করাতে চায়। ছোট বোন ঝর্ণা লেখাপড়ায় খুব ভালো, তাকে এইভাবে কেউ জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ঝুমু খালা জীবনেও ভাবে নাই।

আজকে তেইশ তারিখ শনিবার, যার অর্থ বিয়ে আগামীকাল। ঝুমু খালা যদি খালি বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে পারত তাহলেই সে বিয়ে আটকে দিত। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে, শেষ নাইট কোচটা ছেড়ে দিয়েছে, যার অর্থ কাল সকালের আগে ঝুমু খালা রওনা দিতে পারবে না। বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকাল হয়ে যাবে। ততক্ষণে ঝর্ণাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিবে। কিংবা ঝর্ণা সত্যি সত্যি গলায় দড়ি দিয়ে দেবে।

ঝুমু খালা কী রকম জানি উদ্‌ভ্রান্তের মতো রান্নাঘরের দরজায় বসে রইল। সে এখন কী করবে?

সবার আগে টুনি ঝুমু খালাকে রান্নাঘরের দরজায় গালে হাত দিয়ে এভাবে বসে থাকতে দেখল। টুনি একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে ঝুমু খালা?"

ঝুমু খালা সবকিছু বেশি বেশি করে, যখন অল্প একটু খুশি হওয়ার কথা তখন অনেক বেশি খুশি হয়, যখন অল্প একটু রাগ হওয়ার কথা তখন অনেক বেশি রাগ হয়, যখন অল্প একটু কথা বলার কথা, তখন অনেক বেশি কথা বলে। এই প্রথমবার ঝুমু খালা কোনো কথা না বলে কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, দেখে মনে হলো ঝুমু খালা যেন টুনির কথা বুঝতেই পারে নাই।

টুনি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ঝুমু খালা?"

ঝুমু খালা কোনো কথা না বলে হঠাৎ করে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ঝুমু খালা কাঁদছে–দৃশ্যটা এত অস্বাভাবিক যে টুনি একেবারে হতবাক হয়ে গেল। সে ঝুমু খালার পাশে বসে তার হাত ধরে বলল, "কী হয়েছে ঝুমু খালা, কোনো খারাপ খবর?"

ঝুমু খালা মাথা নাড়ল, বলল, "আমার ছোট বোনটারে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। কাল বিয়ে, আমি বিয়েটা ঠেকাতে পারমু না।"

টুনি বলল, "রাত্রে তো বাস থাকে–"

"নাই। আমার গ্রামে যাওয়ার নাইট কোচ নাই। কাল বিকালের আগে পৌঁছাতে পারুম না–ততক্ষণে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে–"

"তুমি টেলিফোন করো–টেলিফোন করে না করো।"

"টেলিফোন করে লাভ নাই। বড় চাচা ফোন ধরবে না, ধরলেও কথা শুনবে না। খালি যদি আমি নিজে হাজির থাকি তাহলে বিয়েটা ঠেকানো যেত"–বলে ঝুমু খালা আবার মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বিড়বিড় করে বলল, "ঝর্ণারে, তোরে আমি বাঁচাতে পারলাম না–"

টুনি ঝুমু খালাকে রেখে উঠে ভিতরে গেল। ছোটাচ্চু তার ঘরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছিল, টুনি ঘরে ঢুকে বলল, "ছোটাচ্চু, ঝুমু খালা কাঁদছে।"

ছোটাচ্চু ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ বড় বড় করে বলল, "ঝুমু কাঁদছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন কাঁদছে?"

"ঝুমু খালার ছোট বোনকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে সেই জন্যে,। কাল বিয়ে–ঝুমু খালা গিয়ে বিয়ে থামাতে পারবে না, সেই জন্যে ঝুমু খালার খুব মন খারাপ। সেই জন্যে কাঁদছে।"

"রাতে বাস নাই?"

"না।"

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ মুখ সুচালো করে বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল। গাল চুলকাতে চুলকাতে ঘরের ভেতর একটু হাঁটল, তারপর বলল, "তুই যা, ঝুমুকে বল রেডি হতে। আমি একটা গাড়ি ভাড়া করে আনি। ঝুমুকে রাতে তার বাড়ি নিয়ে যাই।"

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। একটা ছোট মেয়েকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে, ফাজলেমি নাকি?"

টুনি ছোটাচ্চুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি হচ্ছ সুইট থেকেও সুইট।"

ছোটাচ্চু অন্যমনস্কভাবে বলল, "শুধু একটা ছোট সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

"কাল বিকালে আমার আর ফারিহার শিল্পকলাতে একটা নাটক দেখতে যাওয়ার কথা ছিল, সেই প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করতে হবে। ফারিহা অনেক দিন থেকে এই নাটকটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল।"

"এটা কোনো সমস্যা না ছোটাচ্চু। ফারিহাপু অনেক সুইট, কিছু মনে করবে না। তুমি একটা ফোন করে বলে দাও।"

"হ্যাঁ, আমি ফোন করে দিই। তুই যা ঝুমুকে বল রেডি হতে।"

টুনি রান্নাঘরে গিয়ে দেখে ঝুমু খালা ঠিক একইভাবে বসে আছে। চোখে একটা শূন্য দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। টুনি ঝুমু খালার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "ঝুমু খালা।"

ঝুমু খালা একটুখানি চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ!"

"তুমি রেডি হও। ছোটাচ্চু তোমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে।"

মনে হলো ঝুমু খালা কথাটা বুঝতে পারল না। কেমন যেন অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "কে বাড়ি নিয়ে যাবে?"

"ছোটাচ্চু। একটা গাড়ি ভাড়া করে আনবে।"

"গাড়ি ভাড়া? আমাকে নেওয়ার জন্যে?"

"হ্যাঁ। তোমাকে নেওয়ার জন্যে।"

"ছোট ভাই গাড়ি ভাড়া করবে? আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ। কাল সকালে পৌঁছে যাবে।"

টুনি ভেবেছিল ঝুমু খালা বুঝি খুশিতে চিৎকার দিবে কিন্তু টুনি অবাক হয়ে দেখল ঝুমু খালা আবার আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বুঝলা টুনি, আগের জন্মে আমি নিশ্চয়ই কুনো একটা ভালো কাম করছিলাম। সেই জন্যে এই জন্মে তোমাদের বাসায় থাকার সুযোগ পাইছি। এই বাসার মানুষেরা সব ফিরেশতা। কেউ ছোট ফিরেশতা, কেউ বড় ফিরেশতা। তা না হলে আমার জন্যে কেউ গাড়ি ভাড়া করে? আমি কে?"

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু মানুষটা সহজ-সরল, কিন্তু তার মনটা ভালো।"

ঝুমু খালাকে রেডি হতে বলে টুনি ছোটাচ্চুর কাছে গিয়ে দেখল ছোটাচ্চু তার বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছে। তার মুখে বিশাল একটা হাসি। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমি যখন ফারিহাকে বললাম ঝুমুকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে গাড়ি ভাড়া করে, তখন ফারিহা রেগে গেল। বলল, তোমার টাকা বেশি হয়েছে? আমি বললাম, একটা ইমার্জেন্সি কেস, টাকা খরচ করতে হবে। তখন ফারিহা কি বলল জানিস?"

"কী বলল?"

"বলল, আমি ঝুমুকে গাড়ি ড্রাইভ করে তার বাড়ি নিয়ে যাব।"

"ফারিহাপু? ফারিহাপু ঝুমু খালাকে বাড়ি নিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। নূতন নূতন ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়েছে তো, গাড়ি চালানোর খুব উৎসাহ। সে নিজে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।"

টুনি হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা!"

"সারারাত গাড়ি চালাতে হবে, এর মাঝে মজাটা কোথায় দেখছিস?"

টুনি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ছোটাচ্চু তোমাকে একটা কথা বলি– তুমি রাগ করবে না তো?"

"কথাটা কী, না জেনে আমি কীভাবে বলব?"

"কথাটা হচ্ছে, আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে?"

ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "তোকে?"

"হ্যাঁ। প্লিজ! ঝুমু খালা কেমন করে বিয়েটা ভাঙে সেটা দেখতে চাই!"

"সারা রাত তুই গাড়িতে বসে থাকবি?"

"হ্যাঁ। ফারিহাপু গাড়ি চালাবে, তুমি পাশে বসবে। আমি আর ঝুমু খালা বসব পিছনে।"

"কে কোনখানে বসবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে?"

টুনি ছোটাচ্চুর হাত ধরে বলল, "প্লিজ ছোটাচ্চু, প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!"

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ মুখ সুচালো করে রেখে বলল, "দেখি তোর আম্মু-আব্বু কী বলে। যদি পারমিশান দেয়–"

"তুমি বললেই দেবে ছোটাচ্চু। প্লিজ তুমি বলো–"

ঝুমু খালা যখন শুনেছে তাকে বাড়ি নেওয়ার জন্যে ছোটাচ্চুর আর গাড়ি ভাড়া করতে হচ্ছে না, ফারিহাপু নিজে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে তখন ঝুমু খালা আবার একটু কেঁদে ফেলল, তারপর চোখ মুছে আগের ঝুমু খালা হয়ে গেল। চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘরবাড়ি মাথায় তুলে ফেলল। কী হয়েছে জানার জন্যে যখন বাচ্চারা ঝুমু খালাকে ঘিরে ধরল তখন ঝুমু খালা হাত-পা নেড়ে বলল, "কত বড় সাহস, আমার ছোট বইনকে, বাচ্চা মেয়েটাকে বিয়া দিতে চায়! আমি খালি একবার পৌঁছে নেই, তারপর দেখো কী করি।"

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "কী করবে ঝুমু খালা?"

"খাবলা দিয়ে যদি চোখ দুইটা তুলে না নেই!"

"কার চোখ তুলে নেবে ঝুমু খালা?"

"যারা আমার বইনকে জোর করে বিয়ে দিতে চায়।"

মুনিয়াকে খুব বিভ্রান্ত দেখা গেল, "চোখগুলি তারপর কোথায় রাখবে ঝুমু খালা?

"বয়মের ভিতরে রেখে দিমু।"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "জামাইকে কিছু করবে না ঝুমু খালা?"

"করব না মানে! ঝাড়ুর মুড়া দিয়ে যদি দাঁত না ভাঙি!"

দৃশ্যটা কল্পনা করে বাচ্চারা সবাই কেমন জানি শিউরে শিউরে ওঠে।

রাত এগারোটার দিকে ফারিহাপু তার গাড়ি নিয়ে চলে এলো। ঝুমু খালা তার ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে রেডি ছিল, সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল।

দাদি বললেন, "ঝুমু, মাথা গরম করে কিছু কোরো না। সবাইকে বুঝিয়ে বলো যে এত ছোট মেয়ের বিয়ে দেয়া ঠিক না।"

বড় চাচা বললেন, "এলাকার টি.এন.ও. আর থানায় খবর দিয়ে রাখবে।"

মেজ চাচি বলল, "তোমার বোন যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলের হেড মাস্টারকে জানিয়ে রেখো।"

বড় ফুপু বলল, "বেশি ঝামেলা হলে সাথে করে এখানে নিয়ে এসো, কয়েক সপ্তাহ এখানে থেকে যাবে।"

শান্ত ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঝামেলা হলে একটা মিসড কল দিবে, আমি চলে আসব। তারপর দেখি কত ধানে কত চাল।"

ঝুমু খালা বলল, "আপনারা খালি দোয়া করেন। দুই-চাইরটা মানুষের ঠ্যাং যেন ভেঙে আসতে পারি।"

সবাই নিচে নেমে গেল, ঝুমু খালাকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে। ছোটাচ্চু টুনিকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে, টুনির আব্বু-আম্মুর কাছ থেকে পারমিশানও নেওয়া হয়েছে। বাসার ছোটরা কেউ জানত না তাই সবাই যখন দেখল গাড়ির পিছনে ঝুমু খালার সাথে টুনিও উঠে বসেছে তখন একসাথে সবাই হই হই করে উঠল। এখন তারাও সবাই সাথে যেতে চায়! গাড়িতে জায়গা নেই, ফেরত আসার সময় ঝুমু খালার ছোট বোন ঝর্ণাকে নিয়ে আসতে হতে পারে, সামনে পরীক্ষা, রাস্তা খারাপ, এই সব কথা বলে ছোটাচ্চু কোনোভাবে সামাল দিল।

ছোটাচ্চু ড্রাইভারের সিটের পাশে বসতেই ফারিহাপু গাড়ি স্টার্ট দিল। বাসার সামনের রাস্তাটা ধরে খানিকটা গিয়ে বড় রাস্তায় ওঠার সাথে সাথে ফাহিরাপু বলল, "শাহরিয়ার সিট বেল্ট বাঁধো।"

"সিট বেল্ট! সিট বেল্ট কেন বাঁধতে হবে?"

"আমার গাড়িতে যে-ই উঠবে তাকেই সিট বেল্ট বাঁধতে হবে।"

"যদি না বাঁধি?"

ফারিহাপু দাঁত বের করে হেসে বলল, "তাহলে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিব।"

ছোটাচ্চু বিরস মুখে সিট বেল্ট বেঁধে নিল।

রাস্তা যথেষ্ট ফাঁকা, ফারিহাপু তার মাঝে গাড়ি চালাতে থাকে। ঝুমু খালা কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফারিহাপুর ড্রাইভিং দেখল, তারপর বলল, "আপা, আপনি বড় সুন্দর গাড়ি চালান। একেবারে এক নম্বর।"

ফারিহাপু হাসল, বলল, "ইচ্ছা করলে তুমিও গাড়ি চালানো শিখতে পারবে। তারপর তুমিও এক নম্বর ড্রাইভার হয়ে যেতে পারবে।"

"আমি পারমু?"

"পারবে না কেন? পৃথিবীর স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী মেয়েরা ছেলেদের থেকে ভালো ড্রাইভার।"

"সত্যি?"

"সত্যি। যে কাজ ছেলেরা পারে, মেয়েরাও সেইটা পারে। বরং ভালো পারে।

ছোটাচ্চু বলল, "এইটা একটু বেশি বলে ফেললে। বলো সমান সমান পারে। ভালো পারে তার কী প্রমাণ আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই গাড়িতে আমাদের প্রমাণ দেওয়ার কোনো দরকার নাই। গাড়িতে আমরা তিনজন তেজি মেয়ে। তুমি একজন দুবলা ছেলে। আমরা যেটা বলব তোমাকে সেটা শুনতে হবে।"

ছোটাচ্চু হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে।"

ফারিহাপু ছোটাচ্চুর সাথে গল্প করতে করতে গাড়ি চালাতে লাগল। ছোটাচ্চু বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল, "ফারিহা, তোমার ড্রাইভ করতে বেশি কষ্ট হচ্ছে না তো? কষ্ট হলে আমাকে বোলো।"

ফারিহাপু বলল, "কেন? তাহলে তুমি কী করবে?"

"তাহলে তুমি গাড়ি থামিয়ে একটু রেস্ট নেবে। হাঁটাহাঁটি করবে। একটু চা-নাশতা খাবে।"

ফারিহাপু বলল, "আমার চা খাওয়ার ইচ্ছা করলে গাড়ি থামাব। হাইওয়ের পাশে চায়ের দোকান চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।"

ছোটাচ্চু বলল, "যখন কেউ রাতে লং ড্রাইভে যায় তখন একজনকে দায়িত্ব নিতে হয়, যে ড্রাইভারের সাথে টানা কথা বলবে, যেন ড্রাইভার ঘুমিয়ে না পড়ে।"

ফারিহাপু বলল, "সেটা ভালো আইডিয়া।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি সেই দায়িত্ব নিলাম, আমি সারা রাত জেগে থেকে তোমার সাথে কথা বলে যাব, যেন তুমি ঘুমিয়ে না পড়ো।"

ফারিহাপু বলল, "থ্যাংকু শাহরিয়ার।"

টুনি গাড়ির পিছনে বসে থেকে লক্ষ করল ছোটাচ্চু ফারিহাপুকে জাগিয়ে রাখার জন্যে তার সাথে জোরে জোরে হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। ফারিহাপু বেশি কথা বলছে না, ছোটাচ্চুর কথার সাথে সাথে হুঁ-হ্যাঁ করে যাচ্ছে।

একটু পুরেই টুনি লক্ষ করল ছোটাচ্চু গাড়ির সিটে মাথা রেখে বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে গেছে। সিট বেল্ট বেঁধে রাখার কারণে মাথাটা বাঁকা হয়ে ছিল, সে কারণেই কি না কে জানে ছোটাচ্চুর নাকডাকা শোনা যাচ্ছে।

বিষয়টা ঝুমু খালাও লক্ষ করল, সে ফারিহাকে বলল, "আপা, একটু আগেই না ছোট ভাইজান কইল হে সারা রাত জাইগা থাইকা আপনার সাথে কথা বলব, এখন দেখি ছোট ভাইজান ঘুমায়।"

ফারিহাপু হাসল, বলল, "থাক ঘুমাতে দাও। মনে হয় সারা দিন ঝামেলায় গেছে।"

"কিন্তু হে যে কইল আপনারে জাগায়া রাখব!"

"সেটা তো রাখছেই। নাকডাকার শব্দটা শুনছ না? এটা দিয়েই জাগিয়ে রাখবে।"

ফারিহার কথা শুনে ঝুমু খালা আর টুনি দুজনেই হি হি করে হেসে উঠল। তাদের হাসির শব্দ শুনে ছোটাচ্চু হঠাৎ ধড়মড় খেয়ে উঠল। চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

ফারিহাপু বলল, "কিছু হয় নাই। তুমি ঘুমাও।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঘুমাব কেন? না, না, আমি ঘুমাব না। আমি জেগে আছি। পুরোপুরি জেগে আছি।"

ফারিহাপু বলল, "ঠিক আছে, তুমি জেগে থাকো।"

টুনিও চেষ্টা করছিল জেগে থাকতে। কিন্তু কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল নিজেই জানে না। ঘুমের ভেতর মনে হলো কয়েকবার গাড়ি থেমেছে। গাড়ি থেকে নেমে কেউ কেউ চা খেতে গিয়েছে। আবার গাড়ি চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ পাশে দিয়ে যাওয়া ট্রাক কিংবা বাসের বিকট হর্নের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে, তারপর সে আবার ঘুমিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত যখন তার ঘুম ভেঙেছে তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। টুনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল, কী সুন্দর একটা ছোট রাস্তা এঁকেবেঁকে গেছে। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছ। যত দূর চোখ যায় সবুজ ধান খেত, বাতাসে ধান গাছের মাথা এমনভাবে নড়ছে যে দেখে মনে হয় বুঝি ধান খেতের উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। দূরে হালকা কুয়াশা, দেখে মনে হয় যেন কেউ একটা ছবি এঁকে রেখেছে।

টুনি জিজ্ঞেস করল, "আর কত দূর ফারিহাপু?"

"মনে হয় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।"

ঝুমু খালা বলল, "সামনে মাগরাবাজার, তারপরেই আমাগো গ্রাম।"

ফারিহাপু জিজ্ঞেস করল, "গাড়ি তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাবে?"

"না। গাঁও-গেরামে কি আর বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায়?"

"তাহলে তুমি আমাকে বলো কোথায় থামতে হবে।"

"জে বলব। বাড়ি থেকে অনেক দূরে থামবেন। আমি আগে চলে যাব, তারপর আমি যখন খবর পাঠাব তখন আপনারা আসবেন। গাড়িটা কাছাকাছি রেখে হেঁটে আসতে হবে। বাড়িতে এসে ভান করবেন আপনারা আমাকে চেনেন না।"

"তোমাকে চিনি না? কেন?"

ঝুমু খালা দাঁত বের করে হাসল, বলল, "সেইটা সময়মতো আপনাদের বলব।"

টুনি বলল, "ঝুমু খালা, আমি কি তোমার সাথে আগে যেতে পারি?"

"আমার সাথে যেতে চাও? হাঁটতে হবে কিন্তু। পারবা?

"পারব।"

"ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার সাথে যাবে।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "আগে গিয়ে কী করবি?"

টুনি মুখ টিপে হেসে বলল, "ঝুমু খালা কেমন করে বিয়েটা ভাঙবে সেইটা দেখতে চাই।"

হঠাৎ করে ঝুমু খালার মুখ শক্ত হয়ে গেল, দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "আমি যদি খাবলা দিয়ে চোখ তুলে না ফেলি তাহলে আমি বাপের বেটি না।"

গাড়ি একটা ছোট বাজার পার হলো, বেশ ভোর, তাই দোকানপাট এখনো খোলেনি। বাজারটা পার হয়ে মিনিট দশেক যাবার পর ঝুমু খালা ফারিহাপুকে বলল, "আফা, সামনে স্কুলের সামনে আপনে থামেন। স্কুলের সামনে একটা গেস্ট হাউস আছে, আপনারা সেইখানে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা-পানি খেতে পারবেন।"

ফারিহাপু গেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি থামাল। দরজা খুলে সবাই নেমে পড়ল। ঝুমু খালা তার ছোট ব্যাগটা নিয়ে বলল, "আফা, ছোট ভাইজান, আমি তাড়াতাড়ি যাই। আপনারা হাত-মুখ ধুইয়া ফেরেশ হন।" তারপর টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো টুনি। অনেক দূর হাঁটতে হবে।"

"চলো ঝুমু খালা।"

ছোটাচ্চু বলল, "গুড লাক ঝুমু। আমরা আছি।"

ঝুমু খালা স্কুলের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। এখনো বেশ সকাল, তাই মানুষজন খুব বেশি নেই। একটা শুকনো ছেলে একটা বিশাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। দুই পাশে ধান খেত। দূরে দূরে এক-একটা গ্রাম, সেখানে গাছপালা, বাড়িঘর।

ঝুমু খালা টুনির সাথে কথা বলতে বলতে পা চালিয়ে হাঁটছে, কিন্তু যতই সে তার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতে লাগল, ততই সে চুপ হয়ে যেতে লাগল। টুনি টের পেল ঝুমু খালার ভেতরে একধরনের অস্থিরতা শুরু হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে ঠিক কী দেখবে জানে না, সেই জন্যে তার ভেতরে এই অস্থিরতা।

প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটার পর ঝুমু খালা একটা বড় পুকুরের কাছে দাঁড়াল, টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই যে সামনে দেখছো জোড়া তালগাছ, সেইটা আমার বাড়ি।"

টুনি বলল, "কী সুন্দর!"

ঝুমু খালা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "জায়গাটা সুন্দর, কিন্তু মানুষের মনটা সুন্দর না, তা না হলে আমার ছোট বোনটারে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে?"

ঝুমু খালা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে, টুনি ঝুমু খালার পিছু পিছু হেঁটে যায়, বড় একটা গাছ পার হয়ে তারা একটা বাড়ির উঠোনে হাজির হলো। সেখানে বেশ কিছু মানুষ, কিছু পুরুষ, কিছু মহিলা, কিছু বাচ্চাকাচ্চাও আছে। লোকজন ব্যস্তভাবে যাওয়া-আসা করছে, কথাবার্তা বলছে, তার মাঝে ঝুমু খালা এসে ঢুকল এবং তাকে দেখে হঠাৎ করে সবাই চুপ করে গেল।

ঝুমু খালা একটু এগিয়ে তার ব্যাগটা নিচে রেখে, শাড়ির আঁচলটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। ঝুমু খালার চেহারার মাঝে সবসময় একটা তেজি ভাব থাকে, শাড়ির আঁচল কোমরে প্যাঁচিয়ে নেওয়ার পর তেজি ভাবটা কেমন যেন একশ' গুণ বেড়ে উঠল। ঝুমু খালা একজন বয়স্কা মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মা, ঝর্ণা কই?"

টুনি বুঝতে পারল এই বয়স্কা মহিলাটা ঝুমু খালার মা। ঝুমু খালাকে দেখে কেমন জানি ভয় পেয়ে গেছে, দুর্বল গলায় বলল, "ভিতরে। ঘরের ভিতরে।"

"গলায় কি দড়ি দিছে, নাকি এখনো দেয় নাই?"

"এইটা তুই কী বলিস, গলায় দড়ি দিবে কেন?"

"গলায় দড়ি দিব কেন তুমি বুঝ নাই? ঝর্ণারে তুমি কি আসলেই পেটে ধরছিলা, সত্যি করে কও দেখি?"

ঝুমু খালার মা কেমন জানি থতমত খেয়ে বলল, "ঝুমু, কী রকম কথা বলিস তুই?"

ঝুমু খালা এবারে ঘরের দিকে এগিয়ে গলা উঁচু করে ডাকল, "ঝর্ণা, এই ঝর্ণা। বাইরে আয়।"

টুনি তখন দেখল ঘরের ভেতর থেকে তার চাইতে একটু বড় একজন মেয়ে প্রায় ছুটে বের হয়ে এসে ঝুমু খালাকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ঝুমু খালা ঝর্ণাকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "কান্দিস না বোকা মেয়ে। মেয়ে হয়ে যখন জন্ম হইছে তখন কান্দাকাটি বন্ধ কর। গলায় দড়ি দিবি তো বল, তোরে দড়ি কিনে এনে দেই।"

ঝুমু খালা এদিক-সেদিক তাকাল। এক পাশে দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝুমু খালা তাকে ডাকল, বলল, "এই জহুরুল। শোন।"

জহুরুল এগিয়ে এলো। ঝুমু খালা বলল, "পাকঘরে যা, গিয়া দা'টা নিয়ে আয়।"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, "দা?"

"হ্যাঁ।"

ঝুমু খালার মা বলল, "দা কেন? দা দিয়ে কী করবি?"

ঝুমু খালা তার মায়ের কথা শুনল বলে মনে হলো না, ছেলেটাকে একটা ধমক দিয়ে বলল, "কী বললাম তোরে! কথা কানে যায় না? দৌড় দে।"

ছেলেটা এবারে সত্যি সত্যি একটা দৌড় দিল এবং প্রায় সাথে সাথে একটা দা নিয়ে বের হয়ে এলো। ঝুমু খালা দা'টা হাতে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করে একটা সন্তুষ্টির মতো শব্দ করে ঝর্ণাকে টেনে তার মায়ের কাছে নিয়ে যায়। তারপর দা'টা তার মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেও মা। দা'টা নেও। তারপর জোরে ঝর্ণার ঘাড়ে একটা কোপ দাও।"

মা রেগে গিয়ে বলল, "কী বলিস তুই ঝুমু!"

ঝুমু খালা শান্ত গলায় বলল, "মা, আমি কোনো ভুল কথা বলি না। কেলাস নাইনে পড়ে বাচ্চা একটা মেয়েরে দামড়া একটা মানুষের সাথে বিয়া দেওয়ার থেকে তারে এক কোপে মাইরা ফেলা ভালো। বিয়া দেওয়ার অনেক যন্ত্রণা মা। দুই দিন পর জামাই আসব যৌতুক নিতে। যৌতুক দিতে না পারলে শ্বশুর-শাশুড়ি-জামাই মিলে এমনিতেই ঝর্ণার গলা টিপে ধরবে। তার থেকে এখন এক কোপে মেরে ফেলো!"

ঝুমু খালার মা বলল, "কী বলিস তুই! জামাই ছেলে খুব ভালো, লন্ডন থাকে। এমনি এমনি কি বিয়ে দিচ্ছি নাকি?"

"না মা, তুমি বিয়া দিচ্ছ না, তুমি ঝর্ণার জীবনটা নষ্ট করতাছ। কিন্তু মা, জেনে রাখো, আমি বেঁচে থাকতে তুমি ঝর্ণারে এইভাবে বিয়া দিতে পারবা না। খোদার কসম। তুমি আমারে এখনো চিনো নাই। টি.এন.ও. সাহেব, ও.সি. সাহেব, হেড মাস্টার সাহেব সবাইরে খবর দেওয়া হইছে। পুলিশ আইসা যদি দেখে আঠারো বছরের কম বয়সে বিয়া দিতাছ, সবাইরে কোমরে দড়ি দিয়া বাইন্ধা হাজতে নিয়ে যাইব!"

হাজতের কথা শুনে হঠাৎ উপস্থিত সবার ভিতরে এবারে একটা আতঙ্কের ভাব ছড়িয়ে পড়ল। সবাই নিচু গলায় গুজগুজ করে নিজেদের ভিতর কথা বলতে থাকে। ঠিক তখন একজন বয়স্ক মানুষ হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে। ঝুমু খালার মা ফিসফিস করে বলল, "তোর বড় চাচা আসছে, খবরদার কোনো বেয়াদপি করবি না।"

ঝুমু খালা বলল, "কী যে বলো মা, আমি মুরব্বিদের সাথে বেয়াদপি করব? সেইটা তুমি কেমন করে ভাবলা?"

ঝুমু খালা এবারে ঝর্ণার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠানের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা টুনিকে দেখিয়ে বলল, "ঝর্ণা, এই হচ্ছে টুনি। তারে নিয়া যা, হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে কিছু খেতে দে।"

ঝর্ণাকে একটুখানি বিভ্রান্ত দেখাল, একবার টুনির দিকে তাকাল আরেকবার ঝুমু খালার দিকে তাকাল। একটু আগে তাকে নূতন বউ হিসেবে কঠিন পাহারার মাঝে রেখেছিল, এখন হঠাৎ করে সে ছাড়া পেয়ে গেছে, কেউ কিছু বলছে না, বিষয়টা সে ভালো করে বুঝতেই পারছে না। কী করবে বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঝুমু খালার কথামতন টুনির কাছেই গেল। টুনিকে বলল, "আসো, ভিতরে আসো। একটু হাত-মুখ ধোও।"

টুনি একটু হাসির চেষ্টা করে বলল, "ঝর্ণাপু, আমি আরো একটুক্ষণ বাইরে থাকি?"

"হাত-মুখ ধোবা না? কিছু খাবা না?"

"পরে। আগে দেখি ঝুমু খালা কী করে।"

ঝুমু খালা যেটা করছিল সেটা অবশ্যি দেখার মতোই একটা দৃশ্য! তার বড় চাচা ঝুমু খালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি কোন সময় আসছ?"

"সকালবেলা চাচাজি।"

"আইসাই একটা ঘোট পাকাচ্ছ? এই জন্যে বলছিলাম সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর যেন তোমারে খবর দেয়।"

"কিন্তুক আগেই খবর পাইছি চাচাজি। মায়ের পেটের বোনের বিয়া, আমি না থাকলে কেমন হয়?"

ঝুমু খালার বড় চাচা মুখ গম্ভীর করে বলল, "ঠিক আছে। আইসা যখন পড়ছোই, থাকো। কিন্তু কোনো ঝামেলা করবা না। অনেক খানদানি ফেমিলির ছেলে–"

ঝুমু খালা তার হাতের দা'টা হাতবদল করে অদৃশ্য একটা কিছুকে কোপ দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "মনে হয় না খানদানি বংশ। তাহলে কেলাস

নাইনের মেয়েরে বিয়া করার জন্যে পাগল হইত না। হাজার হলেও কাজটা বেআইনি। মেয়েদের বিয়ার বয়স আঠারো। ঝর্ণার বয়স মাত্র পনেরো–"

"এইগুলি কে জানে? কে দেখে?"

"জানাইলেই জানে। দেখাইলেই দেখে।" বলে ঝুমু ধারালো দা'টা বিপজ্জনকভাবে ধরে রেখে মুখটা হাসি হাসি করল।

বড় চাচা চোখ ছোট ছোট করে বলল, "তুমি হাসো কেন?"

"এমনিই হাসি।" তারপর হঠাৎ করে মুখটা গম্ভীর করে বলল, "চাচাজি, এই বিয়েতে আমার মত নাই। এই বিয়া বন্ধ করেন।"

"তুমি মত দেওয়ার কে? তুমি মেয়ে মানুষ–"

ঝুমু খালা মুখ শক্ত করে বলল, "চাচাজি, মায়েরে জিজ্ঞাসা করেন মাসে মাসে কে টাকা পাঠায়। সংসার কার টাকায় চলে। এই বাড়িতে মত কে দিতে পারে একবার জিজ্ঞাসা করেন।"

বড় চাচা ধমক দিয়ে বললেন, "বড় বড় কথা বলবা না। বরযাত্রী রওনা দিচ্ছে, দুপুরে পৌঁছে যাবে।"

"আসতে না করেন। বেআইনি বিয়া, পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে বেইজ্জুতি হবে। আপনার বেইজ্জুতি, নূতন জামাইয়ে বেইজ্জুতি।"

বড় চাচা হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "তোমার কথায় পুলিশ আসব?"

"জে না। আমার কথায় পুলিশ আসব না। আমি কে? কিন্তু আমি যেই বাড়িতে থাকি সেই বাড়ির মানুষজনের কথায় পুলিশ আসব। পুলিশের বাবাও আসব। যদি বিশ্বাস না করেন, অপেক্ষা করেন। নিজের চোখে দেখবেন।"

ঠিক তখন একটা ছোট ছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল, "একটা লাল রঙের গাড়ি আসতাছে। লাল রঙের গাড়ি!"

বড় চাচা চমকে উঠল, বলল, "গাড়ি কোথায় আসে?"

ঝুমু উত্তর দিল, "এই বাড়িতে।"

"কেন?"

"আসলে পরে আপনি জিজ্ঞেস করেন।"

যারা আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন ভীত গলায় বলল, "মনে হয় পুলিশ।"

আরেকজন বলল, "না, পুলিশ না। মনে হয় টি.এন.ও. সাহেব।"

এই প্রথমবার বড় চাচাকে বিচলিত হতে দেখা গেল, দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কাজটা ঠিক হইল না।"

"চাচাজি, বেয়াদপি দিয়েন না, কাজটা কিন্তু আসলে ঠিকই হইছে। ঝর্ণা লেখাপড়া শেষ করব, চাকরি করব। তারপর বিয়া করব।"

"ভাত খাওয়ার পয়সা নাই। লেখাপড়ার শখ–"

"ভাত খাওয়ার পয়সা নাই কথাটা ঠিক না। বাপ মরে গেছে বলে আপনারা আমারে লেখাপড়া করতে দেন নাই। এখন আমি রোজগার করি, আমি ঝর্ণারে লেখাপড়া করামু। খোদার কসম।"

বড় চাচা বিষদৃষ্টিতে ঝুমু খালার দিকে তাকাল, তারপর মেঘস্বরে বলল, "বরযাত্রী আইসা যখন দেখব এই অবস্থা তখন কী হবে?"

"একটা ফোন দেন। দিয়া বলেন যেন না আসে। দরকার হইলে আমার কথা বলেন–বলেন যে আমার মাথা আউলাঝাউলা। আমি দা নিয়ে ঘুরতাছি।"

অনেকেই গোল হয়ে ঘিরে কথাবার্তা শুনছিল, হঠাৎ একটা ছোট মেয়ে রিনরিনে গলায় বলল, "ঝর্ণা বুবুর সাথে বিয়া না হলে ঝুমু বুবু তুমি বিয়ে করে ফেলো!"

কথাটা বুঝতে ঝুমুর একটু সময় লাগল, যখন বুঝতে পারল তখন হি হি করে হাসতে লাগল। ছোট মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "বুবু, তুমি হাসো কেন? আমি কি কিছু অন্যায্য কথা কইছি?"

ঝুমু হাসি থামিয়ে বলল, "না, তুই মোটেও অন্যায্য কথা বলিসনি। কিন্তু আমারে বিয়ে করতে সাহস লাগে! এই রকম সাহস কার আছে?"

ছোট মেয়েটা বলল, "তুমি একটু চিল্লাফাল্লা করো বুবু, কিন্তু তোমার মনটা তো ভালা! তুমি রাজি হয়ে যাও।"

ঝুমু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "শোন, তোরে বলে রাখি, কেউ আমারে বিয়া করতে চাইলেই আমি তারে বিয়া করুম না। আমারও তারে পছন্দ হইতে হবে। বুঝলি?"

"বুঝছি।"

"যখন তোর বিয়ার বয়স হইব, তখন তুইও এই কথাটা মনে রাখিস।"

"যাও!" বলে লজ্জা পেয়ে মেয়েটা পিছনে সরে গেল।

এ রকম সময় ছোটাচ্চু আর ফারিহাপু এসে উঠানে ঢুকল, একদল বাচ্চাকাচ্চা তাদেরকে ঘিরে হাঁটছে। একজন মেয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে আসছে, এ রকম বিষয় তারা আগে কখনো দেখেনি!

উঠানের লোকজনের মাঝে একধরনের উত্তেজনা দেখা গেল, দৌড়াদৌড়ি করে দুইটা চেয়ার নিয়ে আসা হলো। গামছা দিয়ে মুছে সেই দুইটা চেয়ার উঠানের মাঝখানে রাখা হলো। ঝুমু খালার বড় চাচা বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে হাত কচলে বলল, "বসেন। বসেন। আপনারা কি টি.এন.ও. সাহেব আর ও.সি. সাহেব?"

ছোটাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আমরা টি.এন.ও. না, ও.সি.ও না। আমরা ঝুমুকে নিয়ে এসেছি।"

ফারিহাপু বলল, "তবে আমি টি.এন.ও., লোকাল থানার ও.সি. আর স্কুলের হেড মাস্টারের সাথে কথা বলেছি। তারা সবাই আসছেন।"

ছোটাচ্চু বলল, "টি.এন.ও. সাহেব একটু ব্যস্ত, কিন্তু আপনাদের বরযাত্রী আসার আগেই চলে আসবেন। আমাদের কথা দিয়েছেন।"

বড় চাচা হাত কচলে বললেন, "অনুগ্রহ করে যদি তাদের বলে দেন তাদের আসার কোনো দরকার নাই। আমরা নিজেরাই বিয়েটা বন্ধ করে ফেলছি!"

টুনি খুবই শান্তশিষ্ট মেয়ে, নিজের আনন্দ বা রাগ প্রকাশ করার জন্য কখনোই চিৎকার-চেঁচামেচি করে না। কিন্তু আজকে কী হলো কে জানে সে আনন্দে একটা চিৎকার দিল এবং সাথে সাথে অন্যান্য বাচ্চাকাচ্চারা তার সাথে চিৎকার করে উঠল। ঝুমু খালাও একটা চিৎকার দিল এবং চিৎকার দেওয়ার সময় তার হাতের ধারালো দা'টা মাথার উপর ঘোরাতে লাগল।

ছোটাচ্চু ভয় পেয়ে বললেন, "এই ঝুমু, তোমার হাতে দা কেন? সর্বনাশ! দা রেখে এসো।"

ঝুমু খালা দাঁত বের করে হেসে বলল, "ঠিক আছে ছোট ভাইজান, দা রেখে আসি।"

বড় চাচা হাত কচলে আবার বলল, "পুলিশকে কি অনুগ্রহ করে আবার একটু ফোন করবেন? বলেন যে আসার কোনো দরকার নাই। বুঝতেই পারছেন, পুলিশ মানেই একটা ঝামেলা!"

ছোটাচ্চু বলল, "কোনো ঝামেলা না। আসুক, আসার পর আমরা কথা বলব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।"

এদিকে বিয়ে বন্ধ করার উত্তেজনা শেষ হবার পর, চাউলের গুঁড়া দিয়ে তৈরি রুটি এবং মোরগের মাংস দিয়ে নাশতা করা হলো। (টুনি নিজের চোখে দেখতে পেল উঠানে ধাওয়া করে মোরগটিকে জহুরুল ধরে এনেছিল।) বড়রা যখন উঠানে বসে গ্রামের নানা ধরনের সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করছে তখন টুনি ঝর্ণাকে ফিসফিস করে বলল, "ঝর্ণা আপু, তোমাদের গ্রামে জরিনী বেওয়া নামে একজন আছে না?"

ঝর্ণা অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আছে। তুমি তার নাম জানো কীভাবে?"

"ঝুমু খালা সবসময় তার গল্প করে।"

"ও!"

টুনি বলল, "আমাকে জরিনী বেওয়ার কাছে নিয়ে যাবে?"

"কেন?"

"এমনি! একটু দেখতে চাই মানুষটা কেমন।"

ঝর্ণা বলল, "ঠিক আছে, তাহলে এখনই চলো যাই।"

"কত দূর?"

ঝর্ণা হাসল, বলল, "ছোট গ্রামের ভিতরে সবকিছু কাছাকাছি। কোনোটাই দূরে না।"

ঝর্ণা টুনিকে নিয়ে বের হলো। একটু আগে যে মেয়েটার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল এখন সে গ্রামে বেড়াতে বের হয়েছে, সেটা যথেষ্ট আলোচনার বিষয়। কাজেই তাকে একটু পরে পরে তার ব্যাখ্যা দিতে দিতে যেতে হলো। যেমন ঝুমু খালার বাড়ি থেকে বের হতেই একজন মহিলা ঝর্ণার পথ আটকাল, বলল, "হেই ঝর্ণা, তোর বিয়া নাকি ভাইঙ্গা গেছে।"

"জি চাচি! আপনাদের দোয়া।"

"এইটা কী রকম কথা?"

"সত্যি কথা। আমি লেখাপড়া করতে চাই চাচি। পাস করে চাকরি-বাকরি নিমু। তারপর বিয়া।"

"জামাই পার্টি কী বলে? বরযাত্রী আহে নাই?"

"রওয়ানা দিছিল। মাগরার বাজারের কাছে আইসা থাইমা গেছে। আর আসার সাহস পায় নাই।"

"ভয়টা কীসের?"

"মনে হয় পুলিশের। আমার বিয়ার বয়স হয় নাই–বিয়া বেআইনি।"

মহিলা চোখ কপালে তুলে বলল, "পুলিশ আইছিল নাকি?"

"জি আইতাছে। ওসি সাহেব আর টি.এন.ও.।"

"সর্বনাশ! কাউরে ধইরা নিব নাকি?"

"জে না চাচি। শহর থেকে যারা আসছে তারা সামাল দিবে।" তারপর টুনিকে দেখিয়ে বলল, "এই যে এই মেয়ে, তার চাচা, চাচার বন্ধু–সবাই আমার বিয়া ঠেকাইতে আসছে।"

মহিলা তখন খুবই তীক্ষ্ণ চোখে টুনিকে পরীক্ষা করল, তারপর বলল, "কয়দিন থাকবা?"

"আজকেই চলে যাব।"

"আজকেই! আমাদের গেরামটা একটু দেইখা যাও।"

"সেই জনেই বের হয়েছি।"

"কোথায় যাও?"

ঝর্ণা বলল, “জরিনী বেওয়ার কাছে।”

মহিলা চোখ কপালে তুলে বলল, “জরিনী বেওয়া? সমস্যাটা কী?”

ঝর্ণা হাসল, বলল, “কোনো সমস্যা নাই। অনেক নাম শুনছে তাই দেখতে চাচ্ছে।”

“যাচ্ছ যখন জরিনী বেওয়ার একটা তাবিজ নিয়া যাইও। লেখাপড়ার তাবিজ, শক্ত তাবিজ। এই তাবিজ নিয়া পাস করে নাই সেই রকম কখনো ঘটে নাই।”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “জি আচ্ছা।”

এই মহিলার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে দশ পা এগোয়নি, তার মাঝে আরেকজন মহিলা তার পথ আটকাল, বলল, “এই ঝর্ণা, তোর বিয়া নাকি ভাইঙ্গা গেছে?”

ঝর্ণা আবার দাঁত বের করে হেসে বলে, “জি চাচি, আপনাদের দোয়া!”

তারপর হুবহু আগের আলোচনা চলতে থাকে!

জরিনী বেওয়ার বাড়ি খুব দূরে নয়, কিন্তু ঝর্ণাকে পথে কথা বলতে বলতে আসতে হয়েছে বলে পৌঁছাতে বেশ সময় লাগল। জরিনী বেওয়ার ছোট একটা মাটির বাড়ি, দরজাটা এত ছোট যে দেখে মনে হয় বুঝি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঝর্ণা ডাকল, “নানি, বাড়ি আছ?”

ভেতর থেকে থুরথুরে একজন বুড়ির গলা শোনা গেল, “কেডা?”

“আমি ঝর্ণা।”

“কুন ঝর্ণা?”

“ঝুমুর ছোট বোন।”

“ও আচ্ছা। কী খবর?”

“একজন মেহমান আসছে, তোমার সাথে দেখা করতে চায়।”

“কী সমস্যা? বিয়া-শাদি? নাকি পরীক্ষা পাস?”

“এগুলো কিছু না, তোমার নাম শুনেছে, তাই তোমারে একবার দেখতে চায়।”

ভিতরে কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর ছোট দরজা দিয়ে একেবারে থুরথুরে একজন বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে বের হয়ে এলো। এত বুড়ি যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মানুষের বয়স হলে চুল কমে যায়, জরিনী বুড়ির মাথা-ভরা চুল এবং সেই চুল শণের মতো ধবধবে সাদা। সারা শরীরের চামড়া কুঞ্চিত, মুখে একটিও দাঁত নেই। এলোমেলোভাবে একটা সাদা শাড়ি পরে আছে।

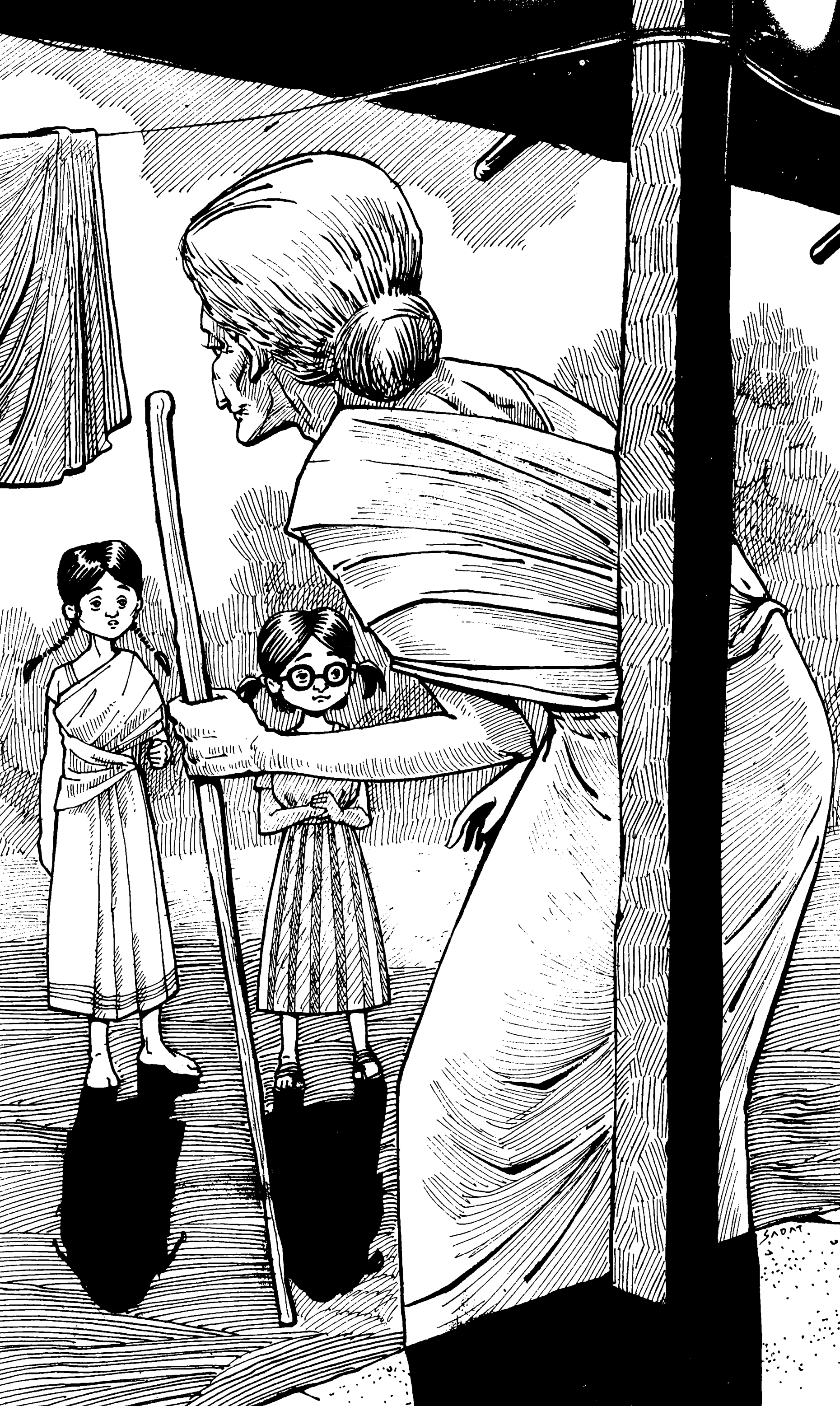
SADAT.

লাঠি ঠকঠক করে বাইরে এসে বলল, "কেডা আমারে দেখতে চায়?"

টুনি বলল, "আমি।" টুনি অবাক হয়ে জরিনী বেওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে মনে মনে জরিনী বেওয়া যে রকম হবে ভেবেছিল হুবহু সে রকম। কথা বলার ধরনটা পর্যন্ত তার কল্পনার সাথে মিলে গেছে। জরিনী বেওয়া চোখ কুঁচকে টুনিকে দেখার চেষ্টা করে বলল, "কাছে আও বইন। আজকাল চোখে দেখি না, কানেও শুনি না। শীতের সময় গরম লাগে, গরমের সময় শীত। রাত্রে চোখে ঘুম আসে না, সারা রাত জাইগা বইসা থাকি।"

টুনি একটু কাছে এগিয়ে গেল, জরিনী বেওয়া টুনিকে দেখে বলল, "চউখে চশমা বইন, কারণটা কী?"

টুনি বলল, "জানি না নানি। ছোট থাকতেই চোখ খারাপ হয়ে গেছে।"

"মনে হয় লেখাপড়া বেশি করছ।" জরিনী বেওয়া তার ঘরের বারান্দায় একটা পিঁড়িতে বসে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে, "সংগ্রামের সময় তোর নানারে যখন পাঞ্জাবিরা মারছে তখন আমার বয়স ষাইট। এখন বয়স একশ'র উপরে–আর কত? আজরাইল আইসা জানটা কবচ করলে তো জীবনটা বাঁচে–"

ঝর্ণা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ল, "কী বলো নানি! তুমি এখনই মরার কথা চিন্তা করো কেন? তুমি এই গ্রামের মুরুব্বি, তুমি না থাকলে আমাগো কে দেখে-শুনে রাখবে?"

"আল্লাহ্ দেখব।"

"তাবিজ-কবজ কে দিব?"

"ধুর বেকুব মেয়ে। তাবিজ কি আমি দেই নাকি? আল্লাহ্‌র কালাম পইড়া ফুঁ দেই। কখনো কামে লাগে কখনো লাগে না।"

টুনি বলল, "ঝুমু খালা আপনার কথা অনেকবার বলেছে। আপনার পানি-পড়া দিয়ে নাকি মানুষের জবান বন্ধ করা যায়। পান-পড়া দিলে বিয়ে-শাদি হয়!"

জরিনী বেওয়া টুনির কথা শুনে খিঁকখিঁক করে হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়। চোখ মুছে বলে, "তুমি ঝুমুর কথা বিশ্বাস করছ? হেই মেয়েটা হইছে আমার পাগলি মেয়ে। তোমারে আসল কথাটি কই, তুমি শুনো।"

টুনি বলল, "বলেন নানি।"

জরিনী বেওয়া ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বলল, "আসলে তাবিজ-কবজ বলে কিছু নাই! যার মন দুর্বল হে আমার কাছে আসে, আমি আল্লাহ্‌র নামে ফুঁ দেই। তাবিজ চাইলে একটা তাবিজ দেই। দোয়া চাইলে মাথায়

হাত দিয়া দোয়া দেই! দুর্বল মানুষ তখন মনে জোর পায়–নিজে নিজে কাম হয়–আর বলে জরিনী বেওয়ার তাবিজ!" কথা শেষ করে জরিনী বেওয়া আবার খিঁকখিঁক করে মাড়ি বের করে হাসতে থাকে।

টুনির মানুষটাকে খুব পছন্দ হলো। সবাইকে পানি-পড়া আর তাবিজ-দোয়া দিচ্ছে কিন্তু নিজে কিছু বিশ্বাস করে না।

টুনি আর ঝর্ণা থাকতে থাকতেই একজন মাঝবয়সী মানুষ এসে জরিনী বেওয়ার সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে বলল, "নানি, বড় বিপদে পড়েছি!"

জরিনী বেওয়া বলল, "কে? তুমি কি শামসুদ্দি নাকি?"

"জি নানি।"

"তোমার বাপের শরীল ভালা?"

"জি নানি। আপনার দোয়া।"

"তা, তোমার সমস্যা কী?"

"নানি, আমার সাদা ছাগলডা খুঁইজা পাই না।"

"ছাগল খুঁইজা পাও না?"

"না, নানি।"

"শেয়াল ধইরা নেয় নাই তো?"

"না নানি, বড় ছাগল। শেয়াল নিব না।"

জরিনী বেওয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তাহলে কি মনে হয় চুরি গেইছে।"

"জি নানি।"

জরিনী বেওয়া একটা নিশ্বাস ফেলল, বলল, "এই গ্রামে তো চুর-ডাকাইত আছিল না।"

"এখন মনে হয় আসতেছে।"

"তোমার কাউরে সন্দেহ হয়?"

"কিছু তো হয় কিন্তুক প্রমাণ নাই।"

ঠিক আছে, "ওই মটকা থেকে এক মুঠ চাউল আনো।"

মানুষটি বারান্দার এক পাশে রাখা মটকা থেকে এক মুঠি চাউল নিয়ে এলো। জরিনী বেওয়া চাউল ধরে রাখা মুঠিটি হাত দিয়ে ধরে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ে ফুঁ দিল। তারপর বলল, "যারে সন্দেহ হয় তারে এই চাউল খেতে দিও। চুরি করলে চাবাইয়া চাউল নরম করতে পারব না। যাও।"

মানুষটি তখন তার গামছায় বাঁধা একটা মাঝারি লাউ বের করে জরিনী বেওয়ার পায়ের কাছে রেখে বলল, "নানি, গাছে লাউ ধরছে। ভাবলাম পয়লা লাউটা তোমারে দিয়া যাই।"

"আমার কি আর লাউ খাওনের সময় আছে! ঠিক আছে, আনছো যখন রাইখা যাও!"

মানুষটা চলে যাবার পর ঝর্ণা বলল, "নানি, তোমারে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি?"

"করো।"

"যে চুরি করেছে সে আসলেই এই চাউল চিবাইতে পারব না?"

জরিনী বেওয়া কিছু বলার আগেই টুনি বলল, "না, পারবে না।"

"কেন?"

টুনি বলল, "তার কারণ যে চুরি করেছে তার মন দুর্বল। যখন শুনবে নানির চাউল পড়া তখন আরো ভয় পাবে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাবে, লালা বের হবে না। সেই জন্যে চাউল চিবাতে পারবে না!"

জরিনী বেওয়া একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি এইটা কেমন করে জানো?"

টুনি বলল, "আমি একটা বইয়ে পড়েছি!"

"বইয়ে এই সব লেখা থাকে?"

"জি নানি, অনেক কিছু লেখা থাকে। কিছু সত্যি, কিছু ভুলভাল, কিছু মিথ্যা!"

জরিনী বেওয়া বলল, "তাই তো বলি বইন, তোমার এত কম বয়সে চউখে চশমা কেন! বই পড়ে পড়ে চউখে চশমা! তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি বইন। খুব খুশি হইছি তোমারে দেইখা। বুদ্ধিরে শান দিও। বুদ্ধিরে শান দিলে বুদ্ধি বাড়ে।"

ঝর্ণা জিজ্ঞেস করল, "বুদ্ধিরে শান দেয় কীভাবে?"

"বুদ্ধির কাম করলেই বুদ্ধির শান দেওয়া হয়। খোদা বুদ্ধি দিছে মানুষরে, আর কাউরে দেও নাই।"

টুনি আরো কিছুক্ষণ বসে জরিনি বেওয়ার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তাদের আবার আজকেই ফিরে যেতে হবে, তাই সে উঠে পড়ল। জরিনী বেওয়া টুনি আর ঝর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিল। হেঁটে যেতে যেতে টুনি একবার পিছন ফিরে দেখল, জরিনী বেওয়া গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা হামান দিস্তায় পান ছেঁচছে। যাদের দাঁত নেই তাদের পান খাওয়া একটা জটিল সমস্যা।

ঝর্ণার সাথে হেঁটে কিছু দূর যাওয়ার পর আবার শামসুদ্দিন নামের মানুষটার সাথে দেখা হলো। রাস্তার এক পাশে সে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। ঝর্ণা জিজ্ঞেস করল, "চাচা তুমি কী খোঁজ?"

"আমার মনে হলো আমার ছাগলের ডাক শুনলাম!"

সামনেই কুচকুচে কালো একটা ছাগল মনোযোগ দিয়ে একটা ছোট গাছের মাথা মুড়িয়ে খাচ্ছে, ঝর্ণা সেইটা দেখিয়ে বলল, "এইখানে ছাগল তো এই একটাই!"

"কিন্তু এইটা কালো ছাগল! আমারটা সাদা।"

শামসুদ্দিন নামের ছাগল হারানো মানুষটা এদিক-সেদিক তাকিয়ে আরো কিছুক্ষণ তার সাদা ছাগলটা খুঁজল, না পেয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে হেঁটে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

ঠিক তখন খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখের একজন মানুষ কোথা থেকে যেন হাজির হলো, মানুষটার ভাবভঙ্গি কেমন যেন সন্দেহজনক। ময়লা কাপড়, ঘাড় থেকে ময়লা একটা ঝোলা ঝুলছে। সেখানে হাত দিয়ে একটা দড়ি বের করে কালো ছাগলটার গলায় দড়িটা বেঁধে ফেলল, তারপর ছাগলটাকে টেনে নিতে লাগল।

ছাগলটা মোটেই যেতে চাচ্ছিল না, রীতিমতো মানুষ-ছাগলে টানাটানি। কিন্তু মানুষটা ছাগলটাকে রীতিমতো টেনেহিঁচড়ে নিতে থাকে।

টুনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, তার কিছু একটা সন্দেহ হলো। তারপরে প্রায় ছুটে মানুষটার কাছে গিয়ে বলল, "এই যে আঙ্কেল–"

মানুষটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আমারে বলো?"

"জি। এইটা আপনার ছাগল?"

মানুষটা বিরক্ত হয়ে বলল, "তা না হলে কার হবে?"

"কী সুন্দর ছাগল! বাহ!" বলে সে ছাগলটার পাশে বসে তার গায়ের উপর হাত বুলিয়ে হাতটা চোখের সামনে নিয়ে আসে। তার হাত কালো রং লেগে কালো হয়ে গেছে। সে নিচু হয়ে ছাগলটাকে শুঁকে দাঁড়িয়ে নাক কুঁচকে বলল, "আঙ্কেল, আপনার ছাগলটার শরীরে জুতার কালির গন্ধ। মনে হচ্ছে জুতা যেইভাবে রং করে এই ছাগলটাকে সেভাবে রং করা হয়েছে।"

মানুষটাকে দেখে মনে হলো সে টুনির কথা বুঝতে পারছে না, মুখটা অর্ধেকটা খুলে সে টুনির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

টুনি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আঙ্কেল, আপনার ঝোলাটা একটু দেখি, ভিতরে জুতার কালি আর ব্রাশ আছে কি না?"

টুনি এগিয়ে যেতেই মানুষটা নিজের ঝোলাটা শক্ত করে ধরে ফেলল, সে ভিতরে দেখতে দিবে না। কী হচ্ছে বুঝতে ঝর্ণার একটু সময় লাগল, এবারে সেও এগিয়ে এসে টুনির সাথে যোগ দিল, দুইজনে মিলে ঝোলাটা

ধরে ফেলল এবং এবারে রীতিমতো একটা টানাটানি শুরু হয়ে গেল। গ্রামের মেঠোপথ, মানুষজন নেই কিন্তু চেঁচামেচি শুনে বাড়ির ভেতর থেকে একজন-দুইজন মানুষ বের হয়ে আসে। মানুষটা হঠাৎ করে নিজের বিপদ বুঝতে পারল, তখন ঝোলাটা ছেড়ে দিয়ে উল্টো দিকে একটা দৌড় দিয়ে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

আশেপাশের বাসা থেকে মানুষজন এগিয়ে আসে, এদের মাঝে শামসুদ্দিনও আছে। ঝর্ণা শামসুদ্দিনকে বলল, "চাচা, এই যে আপনার ছাগল!"

"আমার ছাগল! এইটা?"

"জি। এইটারে কালা রং করছে! রং কাঁচা, হাত দিলে রং উঠে আসছে। এই দেখেন"–বলে ঝর্ণা ছাগলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখাল রং উঠে আসছে।

টুনি ততক্ষণে মানুষটার ঝোলাটার ভিতরে উঁকি দিয়েছে, সত্যি সত্যি তার ভেতরে জুতার কালি, কালি দেওয়ার ব্রাশ, কিছু ময়লা কাপড় এবং একটা টাকার বান্ডিল পাওয়া গেল।

দেখতে দেখতে মানুষের ভিড় হয়ে গেল এবং কীভাবে ছাগল-চোর ধরা হয়েছে গল্পটা ডালপালা নিয়ে ছড়াতে শুরু করল। ঝর্ণাকে ঘটনাটা বর্ণনা করতে হচ্ছে এবং টুনি লক্ষ করল প্রত্যেকবারই ঘটনাটার মাঝে আরেকটু রং লাগানো হচ্ছে! চোরের সাথে হাতাহাতির একটা অংশ কীভাবে জানি ঢুকে গেল। চোরের চেহারার বর্ণনাটা রীতিমতো রোমহর্ষক।

টুনি ঝর্ণাকে ফিসফিস করে মনে করিয়ে দিল যে তাদের ঢাকা ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে, এখন তাদের বাড়ি যাওয়া দরকার।

বিকেলের দিকে টুনি ছোটাচ্চু আর ফারিহাপুর সাথে ঢাকা রওনা দিল। আগের রাত ফারিহাপু ঘুমায়নি, তাই সে দুপুরবেলা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। ঝুমু খালা থেকে গেল। অনেক দিন তার বাড়িতে আসা হয়নি, এসেছে যখন কিছুদিন থেকে যাবে!

গাড়ি ছাড়ার পর ছোটাচ্চু বলল, "ফারিহা, আমি তোমার সাথে টানা কথাবার্তা বলে যাব, যেন তোমার ঘুম না পায়।"

ফারিহাপু মুখ টিপে হেসে বলল, "ঠিক আছে।"

ছোটাচ্চু টানা কথাবার্তা বলতে বলতে কিছুক্ষণের মাঝেই শিশুর মতো ঘুমিয়ে গেল। টুনি ছোটাচ্চুকে জাগিয়ে দিতে চাইছিল; ফারিহাপু বলল, "থাক, তুলে কাজ নেই। বেচারাকে ঘুমাতে দাও–তার চাইতে চলো তুমি আর আমি গল্প করি!"

টুনি হাসি হাসি মুখে বলল, "ঠিক আছে ফারিহাপু, কী নিয়ে গল্প করব?"

"তোমার যেটা ইচ্ছা।"

টুনি কী যেন একটা চিন্তা করল, তারপর বলল, "ফারিহাপু, তুমি বলতে পারবে ছেলেদের যে ওয়াই ক্রোমোজম থাকে সেটার সাইজ এত ছোট কেন? এত ছোট একটা ক্রোমোজোম নিয়ে তারা থাকে, সে জন্যে তারা কি মেয়েদের সামনে লজ্জা পায় না?"

ফারিহাপু হেসে ফেলল, বলল, "সেটা তো জানি না। তোমার ছোটাচ্চু ঘুম থেকে উঠুক, তখন জিজ্ঞেস করতে হবে।"

তারপর দুজনেই ছোটাচ্চুর ঘুম থেকে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে!

BOILOVERS.COM

PRESENT

Some Upcoming magazine

** Rahasya Patrica

** Biggan Chinta

** Kishor Alo

** Current Affears

** Unmad

** Zero 2 Infinite

** Kishor Kantha

** Sananda

কবি

টুনি স্কুলের বারান্দায় বসে দেখছিল তার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা মাঠে ছোটাছুটি করে খেলছে। টুনির ভেতরে একটা বড় মানুষ বড় মানুষ ভাব আছে, তাই সে সবসময় সবার সাথে ছোটাছুটি করতে পারে না। অনেক সময়েই সে বারান্দায় বসে বসে অন্যদের ছোটাছুটি করতে দেখে। টুনি দেখল, খেলার মাঠে কিছু একটা হয়েছে আর তখন একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে পারলে একজন বুঝি আরেকজনকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। ঠিক কী নিয়ে দুইজন ঝগড়া করছে টুনি সেটা বোঝার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখন শুনল রিনরিনে গলার স্বরে কে যেন ডাকল, "টুনি আপু।"

টুনি তাকিয়ে দেখে তাদের স্কুলের ছোট ক্লাসের একটা মেয়ে তাকে ডাকছে। টুনি তার দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কী আপু?"

মেয়েটি ছোট হলেও বড়দের মতো করে বলল, "আমি কি তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

টুনি বলল, "একশ'বার। এসো, আমার পাশে বসো।"

মেয়েটা টুনির পাশে বসে টুনির দিকে তাকাল। টুনি দেখল মেয়েটার চোখে পানি টলটল করছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার?"

মেয়েটা হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, "আমার খুব মন খারাপ।"

"কেন? তোমার কেন মন খারাপ?"

"দৈনিক *নতুন পৃথিবী* পত্রিকা আমাকে অপমান করেছে।"

টুনি চোখ বড় বড় করে মেয়েটার দিকে তাকাল। *দৈনিক নতুন পৃথিবী* এই দেশের অনেক বড় পত্রিকা। সেই পত্রিকা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের পর্যন্ত জীবন বরবাদ করে দেয়, সেই পত্রিকা এইটুকুন একটা বাচ্চা মেয়েকে কেমন করে অপমান করতে পারে টুনি বুঝে পেল না। মেয়েটার কথা শুনে টুনির একটু হাসি পেয়ে যায় কিন্তু সে হাসিটা গোপন করে জিজ্ঞেস করল, "*নতুন পৃথিবী* তোমাকে কেমন করে অপমান করল?"

"এই দেখো।" বলে মেয়েটা তার স্কার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে তাকে দিল।"

টুনি কাগজটা খুলে দেখে সত্যি সত্যি এটা *নতুন পৃথিবী* পত্রিকার প্যাডের কাগজ। সেখানে টাইপ করে লেখা :

প্রিয় মেহজাবিন আরা মিলা

নতুন পৃথিবী ও ম্যান্ডারিন ক্রোকারিজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

তবে তুমি নিজের লেখা কবিতা জমা না দিয়ে অন্য কারো লেখা একটি কবিতা নিজের নামে জমা দিয়েছ দেখে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। যদি এই কোমল বয়সে তুমি এই ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে তুমি বড় হয়ে এই দেশ বা সমাজের কোনো কাজে আসবে না।

কাজেই আমরা আশা করব তুমি ভবিষ্যতে এই ধরনের অন্যায় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
কাতিমুন নাহার
নির্বাহী সম্পাদক
শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রতিযোগিতা

টুনি চিঠিটা পড়ে ছোট মেয়েটার দিকে তাকাল, "এই চিঠিটা তোমাকে লিখেছে? তোমার নাম মেহজাবিন আরা মিলা।"

মিলা নামের মেয়েটা মাথা নাড়ল।

"তুমি এদের প্রতিযোগিতায় একটা কবিতা পাঠিয়েছিলে? নিজের লেখা কবিতা?"

"মেয়েটা আবার মাথা নাড়ল।"

"*নতুন পৃথিবী* মনে করেছে তুমি এটা অন্যের লেখা থেকে চুরি করেছ?"

মিলা ঠোঁট উল্টে প্রায় কেঁদেই দিচ্ছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে মাথা নাড়ল।

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কেন তারা আরো ভেবেছে তুমি আরেকজনের কবিতা চুরি করেছ?"

মিলা বলল, "জানি না।"

"তোমার কবিতাটা কি আছে?

মিলা মাথা নাড়ল, "আছে।"

"দেখি।"

মিলা তখন তার স্কার্টের পকেট থেকে আরেকটা কাগজ বের করে টুনির হাতে দিল। টুনি কাগজটা খুলে দেখে সেখানে একেবারে মুক্তার মতো ঝকঝকে হাতের লেখায় একটা কবিতা লেখা। টুনি জিজ্ঞেস করল, "এটা কার হাতের লেখা?"

"আমার।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "তোমার?"

"হ্যাঁ।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "তুমি এইটুকুন একটা মেয়ে, আর তোমার হাতের লেখা এত সুন্দর?"

মিলা কিছু না বলে চুপ করে রইল।

টুনি তখন কবিতাটি পড়ল :

দূর্বাঘাস ভোরের সূর্যকে ডেকে বলে
দেখো, সারা রাত অনেক ভালোবাসায় জড়ো করেছি
এক ফোঁটা শিশির।
সূর্য হা হা করে হাসে, তারপর প্রখর রোদ্দুর দিয়ে
শুষে নেয় শিশিরের কণা।
সন্ধেবেলা সূর্যের আলো যখন ক্ষীণ ম্রিয়মাণ
দূর্বাঘাস বলে, সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি হারিয়েই যাবে
তাহলে কেন জ্বলে উঠো দুপুরবেলায়?

টুনি হাঁ করে মিলার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, "এটা তুমি লিখেছ?"

মিলা মাথা নাড়ল। টুনি আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি, মানে তুমি লিখেছ?"

মিলা আবার মাথা নাড়ল।

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

"ক্লাস ওয়ান।"

"তুমি ক্লাস ওয়ানে পড়ো আর সূর্যের আলো ক্ষীণ ম্রিয়মাণের কবিতা লেখো?"

এটা টুনির অভিযোগ না প্রশংসা বুঝতে না পেরে মিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, কী হয়েছে?"

"ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েরা স্বরে আ ম আম কিংবা ক লয়ে আকার লা কলা পড়তে গিয়ে দাঁত ভেঙে ফেলে আর তুমি শিশির কণার উপর কবিতা লিখো?"

মিলা একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "লিখলে কী হয়?"

"লিখলে কিছু হয় না। কিন্তু ক্লাস ওয়ানের বাচ্চা কখনো এ রকম কবিতা লিখে না। লিখার কথা না।" টুনি হঠাৎ করে ঘুরে মিলার দিকে তাকাল, তারপর চোখ সরু করে বলল, "তুই সত্যি সত্যি বল দেখি যে তুই নিজে এটা লিখেছিস?"

টুনি খেয়ালই করল না সে হঠাৎ করে মিলাকে তুই করে বলতে শুরু করেছে।

মিলা ঠোঁট উল্টিয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলছিল। অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে বলল, "তুমিও *নতুন পৃথিবী*র মতো আমাকে অবিশ্বাস করছ?"

টুনি গলা উঁচিয়ে বলল, "শুধু আমি কেন, যে কেউ অবিশ্বাস করবে। ক্লাস ওয়ানের বাচ্চা এ রকম কবিতা লিখে না, লিখতে পারে না।" টুনি নিজের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমাকে ছুঁয়ে বল যে তুই নিজে এই কবিতাটা লিখেছিস।"

"ছুঁয়ে বললে কী হয়?"

"তুই যদি মিথ্যা কথা বলিস তাহলে আমি দড়াম করে পড়ে মরে যাব।"

মিলা চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"একশ'বার সত্যি।"

মিলা টুনির হাত ছুঁয়ে বলল, "আমি নিজে লিখেছি। খোদার কসম।"

টুনি তখন তার পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই এবং কলম বের করে মিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এখানে একটা অটোগ্রাফ দে।"

মিলা বলল, "অটোগ্রাফ কী?"

"অটোগ্রাফ হচ্ছে তোর সিগনেচার।"

"সিগনেচার? সিগনেচার কেমন করে দেয়?"

টুনি বলল, "নিজের নাম নিজে লেখাই হচ্ছে সিগনেচার। এখানে তোর নামটা লিখে দিলেই সেটা হবে তোর অটোগ্রাফ।"

মিলা নোটবই আর কলমটা হাতে নিয়ে বলল, "আমাকে কেন অটোগ্রাফ দিতে হবে?"

"তার কারণ তুই একদিন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কবি হবি। কে জানে শুধু বাংলাদেশের না, হয়তো সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কবি হবি! তখন সব মানুষ তোর পিছনে ঘুরবে তোর অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্যে।

আমি তখন বলব কবি মেহজাবিন আরা মিলার প্রথম অটোগ্রাফটা আমার কাছে আছে!"

মিলা লজ্জা পেয়ে টুনিকে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "যাও টুনি আপু।"

"কে জানে, তখন হয়তো তোর অটোগ্রাফটা অনেক টাকায় বিক্রি করা যাবে। আমি অবশ্যি এটা বিক্রি করব না, আমার কাছে রেখে দেব।"

মিলা লাজুক মুখে টুনিকে আরেকটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "যাও টুনি আপু, তুমি শুধু ঠাট্টা করো।"

টুনি মিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি ঠাট্টা-তামাশা করি?"

মিলা মাথা নাড়ল, "না। সবাই বলে তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। সেই জন্যেই তো আমি তোমার কাছে এসেছি।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে। এসেছিস, ভালো করেছিস। এখন কথা বন্ধ করে আগে একটা অটোগ্রাফ দে।"

মিলা লাজুক মুখে নোটবইটার উপর কলমটা রেখে বলল, "শুধু নাম লিখলেই হবে?"

"উঁহু, প্রথমে লেখ প্রিয় টুনি আপু, তারপর লেখ তোমার জন্যে অনেক ভালোবাসা, তার নিচে তোর নাম লিখে আজকের তারিখটা দে।"

মিলা টুনির কথামতো সবকিছু লিখে নোটবইটা টুনির কাছে ফেরত দিল, মেয়েটির হাতের লেখা ঝকঝক করছে। এত ছোট মেয়ের হাতের লেখা এত সুন্দর হতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন।

মিলা এসেছিল খুব মন খারাপ করে, চোখের পানি টলটল করছিল, এখন তার মনটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে, মুখে একটু হাসি ফুটেছে। সে টুনিকে জিজ্ঞেস করল, "এখন আমি কী করব টুনি আপু?"

"*নতুন পৃথিবী*কে একটা শিক্ষা দিতে হবে।"

"কীভাবে শিক্ষা দিবে টুনি আপু?"

"সেটা চিন্তা করে বের করতে হবে। চিন্তা করলে একটা বুদ্ধি বের হয়ে যাবে।"

মিলা বলল, "আমি অনেক চিন্তা করেছি, কোনো বুদ্ধি বের হয় নাই। সেই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।"

"তুই চিন্তা করে সময় নষ্ট করিস না। চিন্তা করাটা আমার আমার উপর ছেড়ে দে। তুই কবি মানুষ, বসে বসে ভোরের শিশির আর ক্ষীণ ম্রিয়মাণ সূর্যের আলো নিয়ে কবিতা লিখতে থাক।"

মিলা বলল, "আমার এত মন খারাপ হয়েছিল যে আমি ঠিক করেছিলাম আর কোনোদিন কবিতা লিখব না।"

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "সে কী! আমি অ্যাডভান্স তোর থেকে অটোগ্রাফ নিয়ে রাখলাম আর তুই কবিতা লিখবি না মানে?"

মিলার চোখ আবার ছলছল করতে থাকে। কোনোভাবে কান্না সামলে নিয়ে বলল, "যখন এই খারাপ চিঠিটা এসেছে আমি তখন সেটা আব্বুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, আব্বু কি বলেছে জানো?"

"কী বলেছে?"

"আব্বু বলেছে, ও আচ্ছা ভেরি গুড!"

"ও আচ্ছা ভেরি গুড? তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ। আমি কী বলেছি আব্বু শুনেই নাই। ও আচ্ছা ভেরি গুড বলে আবার পত্রিকা পড়তে শুরু করেছে।"

টুনি বলল, "কাজটা ঠিক হয় নাই।"

মিলা বলল, "তারপর চিঠিটা আম্মুর কাছে নিয়ে গেছি।"

"তোর আম্মু কী বলেছে?"

"আম্মু বলেছে উচিত শিক্ষা হয়েছে। লেখাপড়া নাই দিন-রাত বসে বসে ঢং করে কবিতা লিখিস, এখন যদি এই ঢং বন্ধ হয়!"

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "হায় হায়! তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ। সবচেয়ে খারাপ কথা বলেছে আমার আপু।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তোর আপু কী বলেছে?"

আপু বলেছে, "তুই আরেকজনের কবিতা নকল করে লিখবি আর তোকে মাথায় নিয়ে নাচবে? তোর লজ্জা করল না আরেকজনের কবিতা নকল করে মেরে দিতে? তুই ছোট বলে ছেড়ে দিয়েছে। বড় হলে তোকে নিশ্চয়ই ধরে জেলে দিয়ে দিত, দুই বছর জেলে বসে বসে টয়লেট পরিষ্কার করলে তুই সিধে হয়ে যেতি।"

টুনি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না। তোর আপুর এ রকম কথা বলাটা একেবারে ঠিক হয় নাই। মিলা, তুই মন খারাপ করবি না। আমি আছি তোর সাথে। তুই যখন অনেক বড় কবি হবি তখন তোকে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞেস করবে, আপনাকে কবি হওয়ার জন্যে কে অনুপ্রেরণা দিয়েছে? তখন তুই মনে করে আমার নাম বলবি কিন্তু!"

মিলা লাজুক মুখে হাসল, হেসে বলল, "তোমার সাথে কথা বলে আমার মন সত্যিই ভালো হয়ে গেছে।"

"গুড। যখন *নতুন পৃথিবী*কে একটা কঠিন শিক্ষা দিব তখন তোর মন আরো ভালো হয়ে যাবে।"

"সত্যি শিক্ষা দেওয়া যাবে?"

"দিতে হবে। একটা প্রতিশোধ নিতে হবে না? প্রতিশোধেই আনন্দ।"

"প্রতিশোধেই আনন্দ?" কথাটা মনে হয় মিলার খুব পছন্দ হলো, একটু পরে পরে বলল, "প্রতিশোধেই আনন্দ! প্রতিশোধেই আনন্দ!"

টুনি পরের দুই দিন একটু খোঁজখবর নিল। *নতুন পৃথিবী* পত্রিকা ম্যান্ডারিন ক্রোকারিজ নামের একটা কোম্পানির সাথে প্রত্যেক বছর শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের চার ভাগে ভাগ করা হয়, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত প্রাইমারি, ক্লাস সিক্স থেকে এইট জুনিয়র, নাইন-টেন সেকেন্ডারি আর ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারি। এই চার ভাগের প্রত্যেক ভাগে তিন ধরনের প্রতিযোগিতা হয়–গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ। প্রত্যেকটা প্রতিযোগিতাতে চ্যাম্পিয়ন, ফার্স্ট রানার্স-আপ আর অনেকগুলো সেকেন্ড রানার্স-আপ পুরস্কার দেওয়া হয়। কাজেই অনেক ছেলেমেয়ে পুরস্কার পায়। পুরস্কার হিসেবে বই দেয়া হয়। *নতুন পৃথিবী*দের নিজেদের বই প্রকশানা আছে, তাই পুরস্কার দিতে তাদের কোনো টাকা খরচ হয় না। যে বইগুলো বিক্রি হয় না সেগুলো পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দেয়।

টুনি খোঁজ নিয়ে দেখল গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ জমা দেওয়ার এখনো সপ্তাহ খানেক সময় আছে। লেখা জমা পাওয়ার ঠিক এক মাস পরে অনেক বড় অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে অনেক হইচই করে পুরস্কার দেওয়া হয়। মিলার সেখানে পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাকে বাতিল করে দিয়েছে।

টুনি মিলাকে শান্ত করার জন্যে বড় গলা করে বলেছে যে সে *নতুন পৃথিবী*র উপর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু কীভাবে প্রতিশোধটা নেবে সে নিজেও জানে না। সে যখন এ রকম একটা অবস্থায় পড়ে তখন সবসময় বাসার অন্যদের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে। এবারেও সে আলোচনা শুরু করল, প্রথম কথা বলল ঝুমু খালার সাথে। ঝুমু খালা পুরো বিষয়টা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, "আমারে পত্রিকার অফিসে নিয়া যাও।"

টুনি বলল, "তুমি পত্রিকা অফিসে গিয়ে কী করবে?"

"ওই মোটা মহিলারে সাইজ করে দিয়ে আসি।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "কোন মোটা মহিলা?"

"যে মোটা মহিলা এ রকম খারাপ একটা চিঠি লিখেছে।"

"তুমি কেমন করে জানো মহিলা মোটা?"

"ঘটনার বর্ণনা শুনেই বোঝা যায়। এ রকম খারাপ চিঠি যে লেখে সে নির্ঘাত মোটা।"

ঠিক তখন শান্ত পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, সে থেমে গিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "কে কাকে খারাপ চিঠি লিখেছে? আছে চিঠিটা? দেখি–"

টুনি বলল, "না শান্ত ভাইয়া, চিঠিটা নাই। এটা পত্রিকা অফিস থেকে লিখেছে আমাদের স্কুলে ক্লাস ওয়ানের একটা বাচ্চার কাছে।"

"কেন? কেন পত্রিকা অফিস থেকে ছোট বাচ্চাদের কাছে খারাপ খারাপ চিঠি লিখবে?"

টুনিকে তখন পুরোটা বলতে হলো এবং সবকিছু শুনে শান্ত মহাখাপ্পা হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "পত্রিকার অফিসটা কয় তলা?"

"জানি না। কেন?"

"তিনতলা থেকে কম হলে নিচ থেকে ঢিল মেরে সবগুলো কাচ ভেঙে দিয়ে আসতাম। উচিত শিক্ষা হতো।"

শান্ত গরগর করতে করতে চলে গেল।

টুনি অন্যদেরকেও জিজ্ঞেস করল, "কেউ বলল মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্যে মামলা করে দিতে, কেউ বলল, *নতুন পৃথিবী* পত্রিকা বয়কট করতে, কেউ বলল অফিসের সামনে মানববন্ধন কিংবা অনশন করতে। কোনোটাই আসলে করার মতো না। তাই সন্ধেবেলা যখন দাদি টেলিভিশন দেখতে বসেছে টুনি তখন দাদিকে পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে কী করা উচিত জিজ্ঞেস করল। দাদি বললেন, "এটা হচ্ছে একটা ভুল বোঝাবুঝি। তোদের স্কুলের ছোট মেয়েটা এতই ভালো কবিতা লিখে যে পত্রিকাওয়ালারা ধরে নিয়েছে সে নিজে লিখেনি। কাজেই কোনো একজন বড় মানুষকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হবে। বলে দিতে হবে আসলেই বাচ্চাটা নিজে লিখেছে। তাহলেই তো ঝামেলা মিটে যাবে। বাচ্চাটা তাহলে একটা পুরস্কারও পাবে, কত খুশি হবে!"

টুনি চিন্তা করে দেখল দাদি আসলে ভুল কথা বলেননি। সে নিজেই দেখেছে মিলার কবিতাটা মোটেও ক্লাস ওয়ানের একটা বাচ্চার লেখা কবিতার মতো মনে হয় না। কাজেই পত্রিকার লোকজন যদি মনে করে মিলা অন্য কারো কবিতা চুরি করে দিয়ে দিয়েছে তাহলে পত্রিকাওয়ালাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করার আগে

নতুন পৃথিবী পত্রিকার লোকজনের সাথে কথা বলা দরকার। কাতিমুন নাহার নামে যে মহিলাটি চিঠিটি লিখেছে তাকে একটা ফোন করে বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে হবে, তারপর তাকে অনুরোধ করতে হবে মিলাকে উৎসাহ দিয়ে সুন্দর একটা চিঠি লিখে দিতে। তাহলেই সবচেয়ে সুন্দর করে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু সমস্যা হলো টুনি ফোন করার মতো বড় কাউকে খুঁজে পেল না। এই সমস্ত কাজের জন্যে ছোটাচ্চু সবচেয়ে ভালো কিন্তু সে কয়েক দিন থেকে লাপাত্তা। তাদের স্কুলের কোনো স্যার আর ম্যাডাম বলে দিলে সবচেয়ে ভালো হতো কিন্তু টুনি স্যার-ম্যাডামদের থেকে দূরে দূরে থাকে, তাই কাউকে বলতে পারবে বলে মনে হয় না। দাদিও কাজটা করতে পারতেন কিন্তু দাদি টেলিফোনে কথা বলতে চান না, মানুষটাকে সামনে না দেখলে দাদি নাকি কথা বলতে পারেন না। এখন দাদিকে তো আর টেনে পত্রিকা অফিসে নেওয়া যাবে না। পত্রিকার অফিস কী রকম হয় সেটা সম্পর্কে টুনির কোনো ধারণা নেই, হয়তো ভিতরে ঢুকতেই দিবে না।

যখন এ রকম অবস্থা তখন শান্ত টুনিকে বলল, "তুই টেলিফোন করার মানুষ খুঁজে পাচ্ছিস না? ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করে দিব।"

টুনি মুখ গম্ভীর করে বলল, "শান্ত ভাইয়া, টেলিফোন করতে হবে একজন বড় মানুষের, তুমি মোটেও বড় মানুষ না।"

শান্ত অবাক হয়ে বলল, "আরে ওই মোটা মহিলা আমাকে দেখবে নাকি? ওই মহিলা জানবে কেমন করে আমি বড় না ছোট? সে শুধু আমার গলার স্বর শুনবে।"

টুনি বলল, "তোমার গলার স্বর শুনে বোঝা যায় যে তুমি বড় মানুষ না। আর ওউ মহিলা মোটা তুমি কেমন করে জানো?"

শান্ত বলল, "ঝুমু খালা বলছিল তাই বলেছি। যাই হোক আমার গলার স্বর শুনে মোটেও বুঝবে না আমি ছোট। আমি বড় মানুষদের মতো গলা মোটা করে বলব।" তারপর শান্ত গলা মোটা করে কথা বলে দেখাল এবং সেটা শুনে টুনি যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমার গলার স্বর শুনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তুমি ইয়ারকি করছ।"

"ঠিক আছে, তাহলে মাইক্রোফোনের উপর কাপড় রেখে কথা বলব। তাহলে গলার স্বর মোটা শোনাবে। এটা হচ্ছে অনেক পুরানো টেকনিক।"

টুনি বলল, "না, তোমাকে কথা বলতেই হবে না।"

শান্ত রেগে গেল, বলল, "কেন আমাকে কথা বলতে হবে না।"

টুনি শান্ত গলায় বলল, "কারণ তোমার মাথা গরম, কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলবে। তুমি এমনিতেই কথা বলতে পারো না। এখানে গুছিয়ে কথা বলতে হবে।"

"গুছিয়ে বলতে হবে মানে?"

"মানে ওদেরকে বোঝাতে হবে প্রডিজি বলে একটা শব্দ আছে–"

"কী বলে শব্দ আছে?"

"প্রডিজি, তার মানে যাদের প্রতিভা একেবারে ছোট থাকতে বের হয়ে আসে। যেমন গাউস কিংবা মোৎজার্ট। আমাদের মিলাও মনে হয় একজন প্রডিজি।

"কী নাম বললি?"

"গণিতবিদ গাউস, সংগীতবিদ মোৎজার্ট।"

শান্ত বিড়বিড় করে নামগুলো মুখস্থ করতে লাগল এবং সেটা দেখেই টুনির একটু সন্দেহ হলো। কিন্তু সন্দেহ হলেও কিছু করার নেই।

সেইদিন বিকালবেলা শান্তকে দেখা গেল খুবই খুশি, তার মুখে বিরাট একটা হাসি। শান্তর মুখে এ রকম বিরাট হাসি দেখেই টুনির মনে হলো যে শান্ত নিশ্চয়ই কোনো একটা অপকর্ম করে এসেছে। জিজ্ঞেস করল, "শান্ত ভাইয়া, কী হয়েছে?"

"বিশাল মজা হয়েছে।"

"বিশাল মজা! কোথায়?"

"*নতুন পৃথিবী* পত্রিকার মোটা মহিলা যা তড়পানি তড়পাচ্ছে সেটা আর বলার মতো না!" কথা শেষ করে শান্ত আনন্দে হা হা করে হাসল।

টুনি আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মোটা মহিলা, কোন মোটা মহিলা?"

"এই যে *নতুন পৃথিবী*র মোটা মহিলা। তোর স্কুলের মেয়ে মিলাকে যে খারাপ চিঠি লিখেছে।"

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি তার সাথে কথা বলেছ? সর্বনাশ! কী বলেছ?"

শান্ত মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি কি কখনো অন্যায় কথা বলি? যা দরকার তাই বলেছি।"

টুনি বলল, "কিন্তু তোমাকে না আমি কথা বলতে না করলাম!"

"আমি কী করব-না-করব সেটাকে তুই না বলার কে? আমার ইচ্ছা হয়েছে কথা বলেছি। ইচ্ছে হলে মারামারি করব। তুই কে?"

টুনি চোখ বড় বড় করে শান্তর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বলেছ? আর *নতুন পৃথিবী* কী বলেছে?

"কত দিবি?"

"কত দিব মানে?"

"মানে আমাকে কত দিবি?"

"তোমাকে দিব কেন?"

"পুরা কথাবার্তা রেকর্ড করা আছে, যদি শুনতে চাস তোকে শুনিয়ে দেব। কত দিবি বল।"

"তুমি সব কথা রেকর্ড করে রেখেছ? তুমি জানো পারমিশন না নিয়ে কথা রেকর্ড করা বেআইনি?"

"বেআইনির খেতা পুড়ি। তোকে শুনাব, তুই কত দিবি বল।"

টুনি মুখ শক্ত করে বলল, "আমি এক পয়সাও দিব না। তুমি শুনাতে চাইলে শুনাও।"

শান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার মুখের হাসিটা বড় হতে থাকল, বোঝাই যাচ্ছে সে নতুন পৃথিবীর সাথে যে কথাবার্তা চালিয়ে এসেছে সেটা তাকে শোনাতে চাচ্ছে। টুনির ধারণা সত্যি, একটু পর শান্ত তার পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করল। টুনি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল "এটা কার ফোন?"

"সেটা তোর জানার দরকার কী? তোকে কথাবার্তা শুনাচ্ছি, চুপ করে শুনে যা।"

শান্ত মোবাইল ফোনের কোথায় টেপাটেপি করল, তখন হঠাৎ কথা শোনা যেতে লাগল। একটা নারী কণ্ঠ কথা বলল, "হ্যালো।"

পুরুষ কণ্ঠ বলল, "আমি শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রতিযোগিতার সভাপতির সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।"

পুরুষ কণ্ঠটি শান্তর, কীভাবে কীভাবে সে জানি মোটা করেছে, মনে হচ্ছে যে বড় মানুষের গলা।

নারী কণ্ঠ বলল, "আমি প্রতিযোগিতা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। কাতিমুন নাহার।"

"ভেরি গুড। আমি একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমার পরিচিত ছোট একটা মেয়ে, নাম মিলা, কয়েক দিন আগে আপনাদের প্রতিযোগিতায় একটা কবিতা পাঠিয়েছে।"

"আমাদের কাছে প্রতিদিন হাজার হাজার গল্প-কবিতা আসে। আমরা–"

শান্ত মহিলাকে মাঝখানে থামিয়ে বলল, "ছোট হলে কী হবে, মিলা অসাধারণ কবিতা লিখে। এখন সমস্যা হচ্ছে তার কবিতাটা দেখে আপনারা মনে করেছেন এটা বুঝি মিলা নিজে লিখেনি! আপনারা ভেবেছেন এটা বুঝি মিলা অন্য কারো কাছ থেকে কপি করেছে।"

মহিলার গলার স্বর এবারে উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। আমরা একটা কবিতা পেয়েছি, যেখানে মেয়েটা দাবি করেছে সে ক্লাস ওয়ানে পড়ে, কিন্তু হাতের লেখা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা ক্লাস ওয়ানের একটা মেয়ের হাতের লেখা না। শুধু তা-ই না, কবিতার ভাষা এবং বিষয়বস্তু রীতিমতো বড় মানুষের। অন্য কোনো বড় মানুষের লেখা নিজের বলে দাবি করে মেয়েটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই টুকুন মেয়ে এত অল্প বয়সে লেখা চুরি করা শিখে গেছে!"

শান্ত বলল, "আপনি আসলে ভুল করছেন। এই মেয়েটি কবিতাটা নিজেই লিখেছে। মেয়েটা একটা প্রডিজি।"

"প্রডিজি? প্রডিজি কি গাছে ধরে?"

"গাউস হচ্ছে গণিতের প্রডিজি, মোৎজার্ট সংগীতের, আমাদের মিলা হচ্ছে সাহিত্যের প্রডিজি। কবিতার প্রডিজি–"

টেলিফোনে যখন এই কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল তখন শান্ত রীতিমতো গর্বের ভঙ্গি করে বুকে থাবা দিল।

মহিলা কেমন জানি ক্ষেপে গেল, বলল, "কবিতার প্রডিজি না, সে হচ্ছে লেখা চুরির প্রডিজি!"

শান্ত খুব অল্পতে ক্ষেপে যায়, শুধু ক্ষেপে যায় না, ক্ষেপে গিয়ে রীতিমতো ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু করে দেয়। কিন্তু অবাক ব্যাপার, মহিলার কথা শুনে সে এবারে একটুও ক্ষেপল না। রীতিমতো মধুর স্বরে বলল, "আপনি খুব বড় ভুল করছেন ম্যাডাম। একজন প্রডিজির প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করছেন না। একটা ছোট শিশুর কোমল হৃদয়ে আঘাত দিচ্ছেন।" শান্ত এবার নিজের বুকে থাবা দিল। নিজের কথা বলার প্রতিভায় সে নিজেই মুগ্ধ!

মহিলা মনে হয় শান্তর কথা শুনে আরো ক্ষেপে গেল, বলল, "কোমল হৃদয়? শিশুর কোমল হৃদয়? আপনি কয়জন শিশুকে দেখেছেন? *নতুন পৃথিবী* পত্রিকায় আমি ছয় বছর থেকে শিশুদের সেকশন দেখি। শিশুদের আমার চেনা হয়ে গেছে!"

শান্ত মধুর গলায় বলল, "সত্যি? আপনি কী রকম চিনেছেন একটু বলবেন? শিশুরা কী রকম?"

মহিলা চিৎকার করে বলল, "আজকালকার শিশুরা হচ্ছে পাজি এবং বদমাইশ। তাদের বাবা-মায়েরা আদর দিয়ে তাদের মাথা খেয়েছে। তারা হচ্ছে পুরোপুরি বখে পাওয়া জেনারেশন।"

"আপনার কি ধারণা আমাদের মিলাও বখে যাওয়া একটা মেয়ে?"

"আপনার মিলা শুধু বখে যাওয়া মেয়ে না, সে হচ্ছে ক্রিমিনাল। কারণ সে লেখা চুরি করে।"

"তাহলে একটা ক্রিমিনালকে কী রকম শাস্তি দেওয়া দরকার বলে মনে করেন?"

"পিটিয়ে লাশ করে দেওয়া দরকার। আমার হাতে যদি থাকত তাহলে আমি পিটিয়ে তাকে সিধে করে দিতাম।"

"ম্যাডাম, আপনাকে একটা কথা বলি?"

"বলেন।"

"আপনি আসলে ভুল জায়গায় কাজ করছেন। আপনি ছোট শিশুদের ভালোবাসেন না, তাদের জন্যে আপনার কোনো সম্মানবোধ নেই। একটি প্রতিভাবান শিশুকে আপনি ধরে নিয়েছেন ক্রিমিনাল। তাহলে আপনি কেন শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন? আপনার কোথায় কাজ করা উচিত জানেন?"

"আপনার মুখ থেকে এটা আমার শোনার কোনো প্রয়োজন নেই–"

শান্ত মধুর গলায় বলল, "আপনার কাজ করা উচিত কসাই হিসেবে। অবলা গরু-ছাগলকে জবাই দেবেন। চামড়া ছিলে মাংস কাটবেন!"

মহিলা গর্জন করে উঠল, "আপনি এভাবে কথা বলবেন না–"

"কিংবা আপনি জঙ্গি হয়ে যেতে পারেন। বোমা মেরে নিরপরাধ মানুষ মারবেন! কিংবা জেলখানায় জল্লাদ হিসাবেও চাকরি করতে পারেন।"

"খবরদার। খবরদার–"

"এত অল্পে রেগে যাচ্ছেন, আপনার ব্লাড প্রেসারটাও পরীক্ষা করা দরকার।"

"ভালো হচ্ছে না কিন্তু–"

"তার সাথে সাথে মাথাটাও!"

খটাস করে একটা শব্দ হলো এবং টেলিফোনটা রেখে দিল।

শান্ত এবারে টুনির দিকে তাকিয়ে আনন্দে হা হা করে হাসতে থাকল। বলল, "কেমন দেখলি? কত সুন্দর করে কথা বলেছি দেখেছিস?"

"দেখলাম।"

"এইটা আমি নূতন শিখেছি। কথা বলার সময় নিজে কখনো রাগতে হয় না। অন্যজনকে রাগিয়ে দিতে হয়। একজন রেগে গেলে শুধু আউল-ফাউল কথা বলতে থাকে। কী মজা হয় তখন!"

শান্ত আপনমনে হাসতে হাসতে চলে গেল। টুনি একটা নিশ্বাস ফেলল, *নতুন পৃথিবী*র উপরে প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় থাকল না। শান্ত অবশ্যি খুব ভুল বলেনি, এই মহিলার আসলেই বাচ্চা-কাচ্চার জন্যে মায়া নেই। ধরেই নেয় বাচ্চা মানেই ইবলিশ। বাচ্চা মানেই দুষ্টু, পাজি, বদমাইশ। কী আশ্চর্য!

পরদিন টুনি স্কুলে গিয়ে মিলাকে খুঁজে বের করল। মিলা টুনিকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল, বলল, "টুনি আপু তোমাকে আজকে খুব সুইট লাগছে।"

টুনি বলল, "ধূর বোকা মেয়ে। আমি কি রসগোল্লা না সন্দেশ যে আমাকে সুইট লাগবে?"

টুনির কথা শুনে মিলা হি হি করে হাসল। বলল, "তুমি যে কী মজা করে কথা বলো টুনি আপু! তুমি কি কখনো কবিতা লিখেছ?"

"মাথা খারাপ হয়েছে তোর? আমি কেমন করে কবিতা লিখব!"

মিলা বলল, "আমার মনে হয় তুমি কবিতা লিখলে অনেক সুন্দর করে লিখতে পারবে।"

"সেটা নিয়েই তোর সাথে কথা বলব। কিন্তু তার আগে আমাকে তোর লেখা খুব ভালো একটা কবিতা দে।"

"কী করবে তুমি?"

"কাজ আছে।"

"তুমি এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি আমার কবিতার খাতাটি নিয়ে আসি।"

মিলা কিছুক্ষণের মাঝেই একটা সুন্দর বাঁধানো খাতা নিয়ে এলো। টুনি মিলাকে নিয়ে বারান্দায় বসে বাঁধানো খাতাটা খুলতেই অবাক হয়ে যায়। প্রত্যেকটা পৃষ্ঠাই ছেঁড়া এবং সেই ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো স্কচ টেপ দিয়ে জোড়া লাগানো। টুনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর কবিতার খাতা এভাবে কে ছিঁড়েছে?"

"আমি।"

"তুই?"

মিলা কেমন যেন লজ্জা পেয়ে যায়। মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ, আমি।"

"কেন?"

"যখন *নতুন পৃথিবী* আমাকে এই খারাপ চিঠিটা লিখেছে তখন আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল আর রাগ উঠেছিল। তাই সবগুলি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম আর জীবনেও কবিতা লিখব না।"

"সর্বনাশ! তারপর?"

"তারপর তুমি যখন-" মিলা থেমে গেল।

"আমি যখন?"

"তুমি যখন সেদিন আমার অটোগ্রাফ নিয়েছ তখন আবার আমার মন ভালো হয়ে গেল। তখন আবার ছিঁড়া টুকরাগুলো বের করে স্কচ টেপ দিয়ে জোড়া দিয়েছি।"

টুনি বলল, "বুঝতে পারছি তুই শুধু কবি না, তুই একটা পাগলি মেয়ে। তোকে দেখে-শুনে রাখতে হবে।"

মিলা হি হি করে হাসল। টুনি কবিতার খাতার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, "এইখানে তোর প্রিয় কবিতা কোনটা?"

মিলা বলল, "মানুষের মন নিয়ে একটা কবিতা আছে।"

টুনি কবিতাটা বের করে পড়ল, তারপর মাথা নেড়ে বলল "ফার্স্ট ক্লাস। এখন তুই একটা কাগজে সুন্দর করে এই কবিতাটা লিখে ফেল।"

"কেন টুনি আপু?"

"আগে লিখে দে তারপর বলব।"

মিলা তার ঝকঝকে হাতের লেখায় কবিতাটা কপি করতে থাকে। টুনি ভুরু কুঁচকে বলল, "এখন আমাকেও একটা কবিতা লিখতে হবে।"

মিলা হাততালি দিয়ে বলল, "তুমি কবিতা লিখবে? বাহ্! কী মজা।"

টুনি বলল, "আগেই এত খুশি হোস না। এর মাঝে কোনো মজা নেই।"

"তুমি কী নিয়ে কবিতা লিখবে টুনি আপু?"

"তোর কোনো আইডিয়া আছে?"

"তুমিও মানুষের মন নিয়ে লিখো না কেন?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু, আমি লিখব রসগোল্লা নিয়ে।"

"রসগোল্লা?" মিলা আবার হি হি করে হাসতে থাকে।

টুনি তখন অনেক সময় লাগিয়ে রসগোল্লা নিয়ে কবিতা লিখল :

বড় ভাই কাড়া, ছোট বোন কাড়ি
বাবা আনল রসগোল্লা আস্ত এক হাঁড়ি
কাড়া বলল আমি খাব, কাড়ি বলে আমি
তারপর কাড়াকাড়ি করল কাড়া-কাড়ি।

কবিতাটা পড়ে হাসতে হাসতে মিলার চোখে পানি এসে গেল, বলল, "টুনি আপু, তুমি খুবই ফানি। তোমার কবিতা তোমার থেকেও ফানি।"

টুনি বলল, "এটা মোটেও আমার অরিজিনাল কবিতা না–আমি কি নিজে লিখতে পারি নাকি? ছোট থাকতে হাসাহাসি নিয়ে একটা কবিতা পড়েছিলাম, সেটা থেকে নকল করে এটা বানিয়েছি।"

টুনি দুটি কবিতা আলাদা করে রেখে দুটি কাগজ নিল। একটা মিলাকে দিয়ে বলল, "তুই এখানে লেখ, শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রতিযোগিতা, তার নিচে লেখ আমি এই প্রতিযোগিতার জন্যে একটা কবিতা পাঠাচ্ছি। তারপর নিচে তোর নাম, ক্লাস, রোল নাম্বার এইসব লেখ।"

মিলা ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন টুনি আপু? আমি মোটেই আর ওদের কাছে কবিতা পাঠাব না। কোনোদিনও পাঠাব না।"

টুনি বলল, "আমি জানি। তোকে তোর কবিতা পাঠাতে হবে না।"

"তাহলে কেন লিখব?"

"একটু পরেই বুঝতে পারবি কেন লিখছিস।"

মিলা মুখ ভার করে লিখল। তখন টুনি নিজের হাতে অন্য কাগজটিতে একই কথা লিখল, নিচে টুনি তার নাম, ক্লাস, রোল নম্বর এইসব লিখল।

টুনি তারপর দুটি খাম বের করল, তারপর বলল, "ধরা যাক তুই আর আমি এই প্রতিযোগিতায় দুইটা কবিতা পাঠাব বলে ঠিক করেছি। ধরা যাক দুইজনে একসাথে বসে দুইটা খামে চিঠি আর কবিতা ভরতে গিয়ে গোলমাল করলাম! তাহলে কী হবে?"

মিলা বলল, "কী হবে?"

"তোর সুন্দর কবিতাটা যাবে আমার নামে! আর আমার ফালতু কবিতাটা যাবে তোর নামে।"

"হ্যাঁ। তাহলে কী হবে?"

"সেটা আমি এখনো জানি না। কিন্তু তুই এত সুন্দর কবিতা লিখিস যে তোর কবিতাটা পুরস্কার পেতেও পারে! কিন্তু এবারে পুরস্কারটা আসবে আমার নামে। আমি যেহেতু ক্লাস ওয়ানে পড়ি না, তাই পুরস্কারটা আমাকে দিয়ে দেবে। আরেকটা খারাপ চিঠি লিখবে না।"

"তাহলে কী হবে?"

"তাহলে পুরস্কার নেওয়ার জন্যে আমাকে স্টেজে ডাকবে–আমি স্টেজে উঠে বলব, ভুল করে তোর কবিতাটা আমার খামে ঢুকে গেছে! আসল পুরস্কারটা পাওয়ার কথা তোর। তখন তোকে স্টেজে ডাকতে হবে–তুই যখন স্টেজে যাবি তখন একটা বিশাল হাউকাউ লেগে যাবে।"

"হাউকাউ?"

"হ্যাঁ। তখন তুই আর আমি মিলে স্টেজে দাঁড়িয়ে সবকিছু বলে দেব। উচিত শিক্ষা হবে তাদের।"

"আর যদি পুরস্কার না পাই?"

"তাহলে অবশ্য কিছু করার নেই। আমরা তখন গোড়া থেকে নতুন একটা কিছু শুরু করব। অন্য একটা প্ল্যান। সেটা হবে প্ল্যান বি। সেটাও যদি না হয় তাহলে শুরু করব প্ল্যান সি। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ না নিচ্ছি ততক্ষণ চলতেই থাকবে।"

টুনিকে অবশ্যি প্ল্যান বি কিংবা সিতে যেতে হলো না, কারণ দুই সপ্তাহ পর টুনি একটা চিঠি পেল, সেখানে লেখা জুনিয়র ক্যাটাগরিতে কবিতা প্রতিযোগিতায় সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে! আরো দুই সপ্তাহ পরে পুরস্কার বিতরণী। তাকে পুরস্কার নেওয়ার জন্যে ওই দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকতে বলেছে।

মিলার সামনে টুনি অনেক সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে সে খুব নার্ভাস। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সে যে নাটকটা মঞ্চস্থ করবে বলে ঠিক করেছে, সেটাতে আসলেই তারা ঠিক ঠিক করে অভিনয় করতে পারবে কি? যদি না পারে তখন কী হবে?

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে টুনি আর মিলা সময়মতো এসে দর্শকদের সিটে মাঝামাঝি বসে আছে। এই অনুষ্ঠানে মিলাকে আনতে গিয়ে টুনিকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। টুনি ছোটাচ্চুকে নিয়ে মিলার বাসায় গিয়ে মিলার আব্বু-আম্মুকে অনেক কিছু বুঝিয়ে মিলাকে এনেছে। বেশ বড় একটা হলঘরে এখন তারা বসে আছে। এখানে সব মিলিয়ে কয়েকশ' মানুষ বসতে পারে। আজকে অবশ্যি বেশিরভাগই কমবয়সী বাচ্চাকাচ্চা। কমবয়সী বাচ্চাকাচ্চা বেশি থাকলে যা হয় এখানে তাই হচ্ছে। সবাই কিচিরমিচির করে কথা বলছে।

টুনি স্টেজটার দিকে তাকিয়ে ছিল, বসার জন্যে সেখানে বেশ কয়েকটা চেয়ার রাখা আছে। সামনে টেবিল, সেই টেবিলে পুরস্কার সাজানো। পুরস্কার হিসেবে মেডেল এবং বই দেয়া হবে। বইগুলো রঙিন ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা আছে। স্টেজটাও খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, পিছনে বিশাল একটা ব্যানার, সেখানে বড় বড় করে লেখা "নতুন পৃথিবী ম্যান্ডারিন ক্রোকারিজ শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রতিযোগিতা", পাশে অতিথিদের নাম। অনুষ্ঠানের সময় বলা হয়েছিল বিকাল পাঁচটা, এখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে, তবুও

অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। কখন শুরু হবে কে জানে! মিলার সামনে টুনি একটা সাহসী ভাব ধরে রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে অসম্ভব নার্ভাস।

হঠাৎ করে হলঘরে একটু উত্তেজনা দেখা গেল, গুরুত্বপূর্ণ চেহারার একজন বয়স্ক মানুষ এসে ঢুকলেন, তখন সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে তাঁকে নিয়ে সামনে সোফায় বসাল। তখন সালোয়ার-কামিজ পরা মোটাসোটা একজন মহিলা স্টেজে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াল, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার ছোট বন্ধুরা, এক্ষুনি তোমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। আমি কাতিমুন নাহার, এই সাহিত্য প্রতিযোগিতা কমিটির সাধারণ সম্পাদক।"

টুনি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে মিলাকে বলল, "এই মহিলাটাই তোকে সেই খারাপ চিঠিটা লিখেছিল।"

মিলা মাথা নাড়ল, বলল, "হুঁ।"

"ঝুমু খালা বলেছিল মহিলাটা মোটা হবে। আসলেই মোটা, দেখেছিস?"

"ঝুমু খালা কে?"

"আমাদের বাসায় থাকে। সবাইকে দেখে-শুনে রাখে। খুব বুদ্ধিমতী।"

"তোমার থেকেও বুদ্ধিমতী।"

"আমার আর কী বুদ্ধি! ঝুমু খালার বুদ্ধি দেখলে তুই ট্যারা হয়ে যাবি।" টুনি স্টেজে কাতিমুন নাহারকে দেখতে দেখতে বলল, "এত বড় একটা অনুষ্ঠান আর এই মহিলা সালোয়ার-কামিজ পরে চলে এসেছে। তার শাড়ি পরে আসা উচিত ছিল।"

মিলা বলল, "শাড়ি পরলে সবাইকে কী সুন্দর লাগে, তাই না টুনি আপু?"

"হ্যাঁ। আমি যখন বড় হব তখন সবসময় শাড়ি পরব।"

মিলা বলল, "আমিও।"

স্টেজে ততক্ষণে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটার সাথে আরো কয়েকজন মানুষ স্টেজে গিয়ে বসেছে। কাতিমুন নাহার কিছুক্ষণ কথা বলল, অন্যেরাও কিছুক্ষণ কথা বলল। বড় মানুষেরা এত বেদরকারি কথা বলতে পারে যে, দেখে টুনি অবাক হয়ে যায়। সে যখন বড় হবে তখন সে মরে গেলেও স্টেজে উঠে বক্তৃতা দেবে না। জীবনেও একটা বেদরকারি কথা বলবে না।

শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শেষ হলো। তারপর পুরস্কার বিতরণ শুরু হলো। প্রথমে প্রাইমারি, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো স্টেজে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেহারার বয়স্ক মানুষটার কাছ থেকে মেডেল আর পুরস্কার নিল। তারপর মাইকের সামনে গিয়ে নিজেদের লেখা, গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ থেকে একটুখানি পড়ে শোনাল, তারপর স্টেজ থেকে নেমে গেল।

এরপর জুনিয়র গ্রুপ, টুনির বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড জেট প্লেনের ইঞ্জিনের মতো শব্দ করতে লাগল। প্রথমে গল্পের জন্য পুরস্কার দেয়া হলো, তারপর কবিতা। টুনি শুনতে পেল জুনিয়র গ্রুপে কবিতা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তাকে স্টেজে ডাকা হয়েছে।

টুনি স্টেজের দিকে রওনা দিল, মনে হচ্ছে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, তার মুখ থেকে রীতিমতো গরম ভাপ বের হতে লাগল। সে কি পারবে অনেক যত্নে করে তৈরি করা নাটকটা ঠিকমতো মঞ্চস্থ করতে?

টুনি অনেকটা আচ্ছন্নের মতো স্টেজে হাজির হলো, গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটা তার গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিল, হাতে সার্টিফিকেট আর বই।

কাতিমুন নাহার তখন টুনির হাতে মিলার লেখা কবিতাটা দিয়ে তাকে সেটা পড়ে শোনাতে বলল।

টুনি এক হাতে কবিতাটা নিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ায়, কবিতাটা পড়ার ভঙ্গি করে হঠাৎ করে থেমে গেল, তারপর এদিক-সেদিক তাকাল, তারপর মাইকে বলল, "কিছু একটা ভুল হয়েছে।"

কাতিমুন নাহার এগিয়ে এলো, বলল, "কী ভুল?"

"এই কবিতাটা আমার লেখা না।"

"তাহলে কার লেখা?"

"আমাদের স্কুলের আরেকটা মেয়ে। আমরা দুইজন একসাথে খামের ভিতর কবিতা ঢুকাচ্ছিলাম তখন ভুল করে তার কবিতাটা আমার খামে ঢুকে গেছে।"

টুনি হঠাৎ করে টের পেল তার ভেতরে এতক্ষণ যে একটা ভয় কাজ করছিল হঠাৎ করে সেই ভয়টা কেটে গেছে। সামনে হলভর্তি মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে, তবুও সে আর নার্ভাস না। টুনি খুব শান্তভাবে তার গলা থেকে মেডেলটা খুলে কাতিমুন নাহারের দিকে এগিয়ে দিল। বলল, "এই কবিতাটা যে লিখেছে তাকে এই পুরস্কারটা দেন।"

কাতিমুন নাহার যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, "তোমাদের যন্ত্রণায় আর পারা গেল না। একজনের কবিতা আরেকজনের নামে চালিয়ে দিচ্ছ?"

টুনি গলা উঁচু করে বলল, "আমি মোটেই আরেকজনের কবিতা নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছি না, আমি মেডেলটা ফেরত দিয়েছি। আসলে যার পুরস্কার পাওয়ার কথা তাকে পুরস্কারটা দেন।"

"সে কি আছে এখানে?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "আছে।"

মোটাসোটা কাতিমুন নাহার তখন স্টেজে বসে থাকা মানুষদের সাথে কথা বলল, তারপর ফিরে এসে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাদের ছোট একটা গোলমাল হয়েছে। একজনের কবিতার জন্যে ভুলে আরেকজনকে পুরস্কার দিয়ে দেয়া হচ্ছিল। আমরা এখন অপূর্ব একটা কবিতা লেখার জন্যে সত্যিকার চ্যাম্পিয়নকে পুরস্কার নেয়ার জন্যে তাকে স্টেজে আসতে বলছি।"

তারপর কাতিমুন নাহার টুনিকে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম?"

"আমি বলি।" বলে টুনি কাতিমুন নাহারকে প্রায় ঠেলে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মেহজাবিন আরা মিলা। স্টেজে চলে আয়।"

মিলার নাম শুনে কাতিমুন নাহারের নাদুসনুদুস দেহ ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল, কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সবাই অবাক হয়ে দেখল পাঁচ-ছয় বছরের ছোট একটা মেয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে স্টেজের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে হলভর্তি মানুষ নিঃশব্দ হয়ে গেল, তারপর ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল, তারপর একজন হাততালি দিল। তখন সবাই মিলে একসাথে হাততালি দিতে লাগল।

মিলা স্টেজে ওঠার পর চেয়ারে বসে থাকা মানুষেরা অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটি চোখ বড় বড় করে মিলাকে বললেন, "তুমি এই কবিতাটি লিখেছ?"

মিলা কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। মানুষটা বলল, "কী আশ্চর্য! এসো, আমার কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে যাও।"

মিলা মাথা নাড়ল, বলল, "না, আমি পুরস্কার নিব না।" তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার কাছে লেখা চিঠিটা বের করে গুরুত্বপূর্ণ চেহারার মানুষটার হাতে দিয়ে বলল, "আমি একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম, সেটা পেয়ে *নতুন পৃথিবী* আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে।"

গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা চিঠিটা পড়ে মাথা নাড়তে থাকেন। মিলা বলল, "বড় বড় মানুষেরা যখন আমাদের মতো ছোট মানুষের কাছে এ রকম চিঠি লিখে তাহলে আমাদের খুব মন খারাপ হয়।"

কাতিমুন নাহার এগিয়ে এসে বলল, "আসলে হয়েছে কী, আমি, মানে–"

মিলা কাতিমুন নাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যদি কবিতা লিখতে পারি সেটা আমার দোষ?"

নতুন পৃথিবী

গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা বলল, "উই আর ভেরি সরি। এসো তুমি এখন তোমার পুরস্কারটা নিয়ে যাও। তুমি কাছে এসো, তোমার গলায় মেডেলটা পরিয়ে দিই।"

মিলা মাথা নাড়ল, বলল, "না। যে বড় মানুষেরা আমার মতো ছোট মানুষের মনে কষ্ট দেয় আমি তাদের কাছ থেকে পুরস্কার নিব না।" তারপর টুনির হাত ধরে বলল, "চলো টুনি আপু, আমরা যাই।"

টুনি বলল, "চল।" তারপর টুনি মিলার হাত ধরে স্টেজ থেকে নেমে এলো। পুরো হলের মানুষ নিঃশব্দে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিলা টুনির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "পুরস্কার থেকে বেশি আনন্দ প্রতিশোধে! তাই না টুনি আপু?"

টুনি মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক বলেছিস।"

হল ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই শুনতে পেল ভেতরে প্রচণ্ড হই-হল্লা শুরু হয়েছে। আর কী আশ্চর্য এর মাঝে একজন চিৎকার করে বলছে, "আমার কাছে এই নাদুসনুদুস মহিলার রেকর্ডিং আছে, শুনে দেখেন সে বাচ্চাদের সম্পর্কে কী কথা বলে। শুনে দেখেন–"

গলার স্বরটা শান্তর। কী আশ্চর্য। শান্ত এখানে কীভাবে এসেছে? কখন এসেছে?

টুনি আর মিলা তাড়াতাড়ি হেঁটে যেতে থাকে। তারা পিছন দিকে তাকায় না, কারণ তাদের মনে হয় কয়েকজন ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা নিয়ে তাদের কাছে ছুটে আসছে!